পতাকার কথা, পতাকার রাজনীতি

পতাকার কথা, পতাকার রাজনীতি

সম্পাদনা

লিনু হক

অঙ্কুর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

সম্পাদনা
লিনু হক

প্রচ্ছদ
গুপু ত্রিবেদী

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৭৮৮-৩৮৫৯৭৪

মুদ্রণ :
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪

ISBN: 978-984-98958-1-7

মূল্য : ৩৬০.০০ টাকা

উ ৎ স র্গ

উৎসর্গ তাঁদের যাঁরা পতাকার সৃষ্টির সাথে জড়িত ছিলেন।
আর, যাঁরা আমাকে 'পতাকার কথা পতাকার ইতিহাস' বই আকারে
প্রকাশের জন্য সহযোগিতা করেছেন– তাঁদের সকলকে।

সম্পাদকের কথা

পতাকার রূপকার নকশাকার প্রসঙ্গ

কোনো বিষয়ের অতীত জানাকেই ইতিহাস বলা হয়। আমরা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক পড়ে জেনেছি ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাসই ইতিহাস। ইতিহাসের আভিধানিক অর্থ পুরা বিত্ত বা ইতিবৃত্ত। মানুষের প্রাচীন কথা বা কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে উপদেশদানের মাধ্যমে যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, তাই ইতিহাস।

ইংরেজি হিস্ট্রি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ হিস্টোরিয়া থেকে। হিস্টোরিয়ার মূল অর্থ অনুসন্ধান। অপ্রধান অর্থ অনুসন্ধান দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। আর একটু বিস্তৃত অর্থ হলো অনুসন্ধান দ্বারা লব্ধজ্ঞানের লিপিবদ্ধ দলিল। কাজেই কোনো খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাস বিচার সম্ভব নয়।

'সত্য' বিশেষণ পদ; সত্য হচ্ছে প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তব, নির্ভুল, আসল ইত্যাদি। সত্য একটি মৌলিক শক্তি। যদি কোনো বিষয় প্রকৃতই ঘটেছে বলে মনে করা হয়, তখন তা সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অসত্য কিছু বর্ণনাকেও মিথ্যার পর্যায়ে ফেলা হয়। অর্ধ-সত্য বিষয়ে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে অথবা কিছু সত্য বিষয় তুলে ধরা হলেও পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় না। কোনো কিছু অসত্যভাবে বললে বা বিবৃত করলে তা মিথ্যার পর্যায়ে উপনীত হয়। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি 'সদা সত্য কথা বলিবে।' রাষ্ট্র পরিচালকদের এই শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

মহামান্য আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময়ও শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। 'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না।' সত্যের তীব্রতা এবং সত্যর শক্তি অপরিসীম। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সত্য তার আপন আলোয় কারও না কারও হাত ধরে প্রকাশিত হয়।

আমরা সত্য দেখতে ও জানতে চাই। সত্য কী এটি কল্পনার বিষয় নয়, সত্য কী এটি কোনো শব্দ দিয়ে বলা হয়নি বা চিত্র আঁকা হয়নি, সত্য অনুভবের পূর্বে এর কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। সত্য কেমন? সত্যের পর্দা যখন উন্মোচন হবে, তখন যারা যা কিছু সত্য বলে মেনে চলছিল, তারা বুঝতে পারবে এতদিন যা শুনে জেনে প্রকাশ করছিল, তা সত্য নয়।

বাংলাদেশের পতাকার ইতিহাসের খণ্ডিত চিত্র নিয়ে পতাকার ইতিহাসের রূপকার, নকশাকার ইত্যাদি আমরা বানিয়েছি। পতাকার ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত চিত্র উন্মোচন হলেই পতাকার সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব। পতাকার ইতিহাসে খণ্ডিত চিত্র নিয়ে '৯০ দশক থেকে শিবনারায়ণ দাশকে বাংলাদেশের পতাকার রূপকার, অঙ্কনকার বলা হচ্ছে। এ নিয়ে কূটতর্ক কম হয়নি।

আরবি ইতিহাসবিদ তাবারি বলেছেন, ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরকে জানি এবং জানাই। যেমন করে অন্যরা আমাকে জানিয়েছেন। ইবনে খালদুন বলেন- ইতিহাস হলো মানবসভ্যতার কাহিনি, সমাজে যে পরিবর্তন আসে তার কাহিনি। তার মতের কাছাকাছি মত যেকোনো সময়কে বোঝার চেষ্টাই সেযুগের ইতিহাস। সমস্ত সমাজ জাতির ক্রমবিকাশের কথা হলো ইতিহাসের সারমর্ম। ইতিহাস হলো একটি সমাজবিজ্ঞান যার উদ্দেশ্য জাতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরা। ইতিহাসকারদের কাজ হলো বাস্তব ঘটনা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা। প্রতিষ্ঠিত ঘটনা সময়ের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা।

শিবনারায়ণ দাশের মৃত্যুতে পত্র-পত্রিকা, সামাজিক মাধ্যম স্রোতের মতো কেউ তাকে পতাকার রূপকার, কেউ নকশাকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খুবই কঠিন কাজ। এ কাজটিতে আমাকে সাহস যুগিয়েছে সে সময়কাল। কারণ আমি সে সময়ের ছাত্রলীগের রাজনীতির একজন কর্মী। শওকত ওসমান বলেছেন, 'স্মৃতি সমস্ত কওমকে জেন্দা করে তুলতে পারে।' আমার স্মৃতিতে সে সময়কালে ধুলার আস্তর পড়ে না। কারণ সময়টা একটি জাতির সৃষ্টির কাল, জন্মের কাল। আর একটি জাতির পরিচয় তার পতাকা।

’৯২ থেকে ’৯৪ আমি আমার জীবনসঙ্গীর কর্মস্থল (ডেপুটেশন) মালয়েশিয়া ছিলাম। ’৯৪ সালের শেষে দেশে ফিরে এসে আমি মায়ের বাসায় উঠি। কথা প্রসঙ্গে ছোট ভাই জাকির আমার কাছে জানতে চায় তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘অলিম্পাস ফুড কোম্পানির’ ম্যানেজার হিসেবে শিবনারায়ণ দাশ কর্মরত। তিনি ছাত্রলীগ করতেন, বাংলাদেশের প্রথম পতাকার রূপকার, তাকে আমি চিনি কি না? আমি বলি তাকে আমি ’৭০ সাল থেকে এবং তার জীবনসঙ্গী গীতশ্রীকে ’৭২ সাল থেকে চিনি, তিনি আমাদের শিবুদা। তবে তিনি বাংলাদেশের পতাকার রূপকার নন। তিনি পতাকার মানচিত্র অঙ্কন এবং রঙ করে দিয়েছিলেন। ভাই বলে, কিন্তু তিনি তো বলেছেন তিনি পতাকার রূপকার। উত্তরে বলি, তিনি যদি বলে থাকেন, সঠিক বলেননি। তুই তাকে পরিচয় দিস, তুই আব্দুল বাতেন চৌধুরীর ভাগ্নে।

সালটা ২০০৭/ ২০০৮ হবে, সঠিক মনে নেই। চ্যানেল আইতে আধঘণ্টার একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থাপক অরুণ চৌধুরী (শিবুদার শ্যালক) শিবনারায়ণ দাশের কাছে পতাকার রূপকারের নাম জানার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি এড়িয়ে যান। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে দেখেছি পতাকা নিয়ে একটি সংগঠনে শিবুদা বক্তব্য রাখছেন। বক্তব্যে বলছেন পতাকা তৈরিতে আমার সঙ্গে অনেকে ছিলেন। শিবুদা একবার উচ্চারণ করেনি তার নেতাদের কথা, বিস্মিত হয়েছি।

আমি তখন আমার জীবনসঙ্গীর কর্মস্থল সেনাবাহিনীতে। সেনাবাহিনীর নিয়মানুযায়ী সেনাবাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলার বাইরে আমার কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। জীবনসঙ্গী সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আমি অনেকবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছি। শিবুদাকে বলেছি সত্যটা বলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন কিংবা বলেছেন সত্য বলার সময় এখন নয়। সময়মতো বলবেন।

ইউসূফ সালাহউদ্দীন অনলাইনে চ্যানেল ২৪-এর একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরাতো মরে যাইনি, এখনও বেঁচে আছি। শিবুদাকে কেন পতাকার রূপকার বানানো হচ্ছে?’ তিনি পতাকা তৈরির কাহিনি তুলে ধরেন। ২০২২ গীতশ্রী চৌধুরী অনলাইনে একটি সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে আসেন। উপস্থাপক (নাম মনে নেই) গীতশ্রীকে প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামী শিবনারায়ণ দাশ তো বাংলাদেশের পতাকার রূপকার। গীতশ্রী চৌধুরী তাতে সম্মতি জানান। দেখে আমি সেখানে প্রতিবাদ করি। মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের মানস জগতের পরিবর্তন ঘটেছে, আমাদের মধ্যে আমিত্ববোধ বাসা বেঁধেছে, আমরা অন্যের ভূমিকা গৌণ করে নিজের ভূমিকা প্রধান করে তুলছি।

শিবনারায়ণ দাশ, কামরুল হাসানকে ছোট করার জন্য নয়, তাঁদের পতাকার নায়ক বানাবার যে মিথ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মিথ ভেঙে সত্যটা তুলে ধরাই আমার অভিপ্রায়। শিবনারায়ণ দাশ একজন মুক্তিযোদ্ধা, কামরুল হাসান মুক্তিযুদ্ধের অংশীজন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁর যেখানে অবস্থান, তাকে সঠিক জায়গায় সম্মানিত করা এবং পতাকার জন্ম ইতিহাস প্রজন্মকে জানানোই আমার উদ্দেশ্য।

পতাকার রূপকাররা আমার খুব পরিচিত, একসময়ের কাছের মানুষ, তাঁদের কাছে পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য ছিল না। যাঁরা বেঁচে আছেন, আর যাঁরা বেঁচে নেই, জীবিতকালে দেওয়া তাঁদের তথ্য আমি বইতে তুলে এনেছি।

কিছু নাম এবং কিছু কথায় পরস্পরের সঙ্গে অমিল আছে, কিছু নামের হেরফের আছে। কিন্তু সেটি মুখ্য নয়। পতাকা তৈরির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং চিন্তা পতাকার রূপকার এবং অন্যদের লেখায় বিস্তারিত উঠে এসেছে। আশা করি পাঠক এ বই থেকে পতাকার সঠিক ইতিহাস জানতে পারবেন। বইটি প্রকাশে যাঁরা নানা তথ্য এবং লেখা দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

লিনু হক, ঢাকা
৩০ জুন ২০২৪

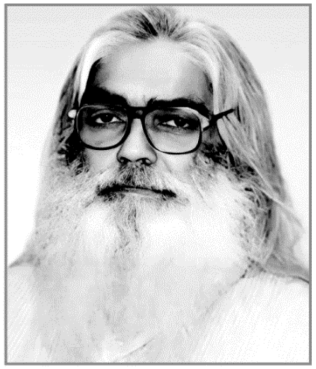

সিরাজুল আলম খান

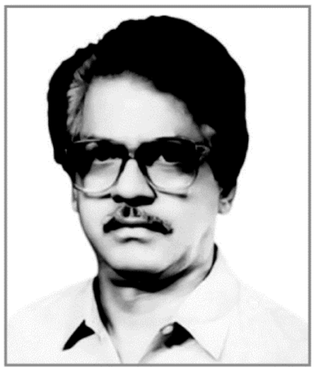

কাজী আরেফ আহমেদ

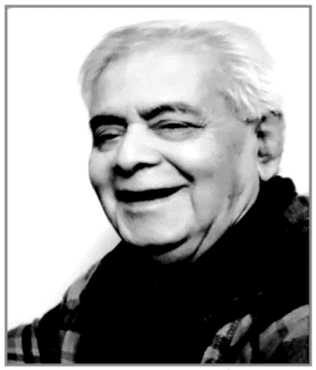

মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মণি)

আ স ম আবদুর রব

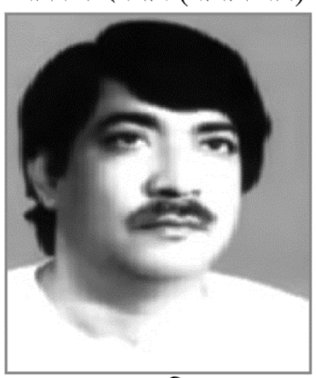

শাজাহান সিরাজ

প্রথম ভাগ

কাজী আরেফ আহমেদ / ১৫

মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) / ২০

আ স ম আবদুর রব / ২৬

শাজাহান সিরাজ / ৩১

ইউসুফ সালাহউদ্দীন আহমদ / ৩৫

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন / ৪০

শিবনারায়ণ দাশ / ৪৬

রায়হান ফেরদৌস মধু / ৫৪

জাতীয় পতাকা

কাজী আরেফ আহমেদ

[কাজী আরেফ আহমেদ ১৯৬০-এর দশকের ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অধুনালুপ্ত পাক্ষিক *তারকালোক* পত্রিকায় ৮ কিস্তিতে লিখেছিলেন। পাক্ষিক 'তারকালোক' এর লেখাগুলোসহ কাজী আরেফ আহমেদের অন্যান্য লেখা নিয়ে *বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্র* বই প্রকাশিত হয় জুলাই ২০১৪ সালে কাজী আরেফ আহমেদের মৃত্যুর পর। *বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্র* বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন সিরাজুল আলম খান। বইটি সম্পাদনা করেছেন আহসান উল্লাহ। নিচের অংশ *বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্র* বইয়ের ১১৫-১২০ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত।]

১৯৭০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আমাকে একটি 'পতাকা'র ধারণা করতে বলা হয়। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী' নামের একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী গঠন করার এবং '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী'-এর একটি ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ তৈরি করার। আমার পরিকল্পনা ছিল '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী'র জন্য যে ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ তৈরি করা হবে, সেটিকে জাতীয় পতাকার সম্মান দেওয়ার। কিন্তু রাজ্জাক ভাই বিষয়টি আরও গভীরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। তাই সেদিন মেরুন ও হলুদ রঙের ব্যানারে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তাতে 'জয় বাংলা' ও '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী' লিখে মিছিলের সামনে বহন করা হয়। প্রত্যেক কর্মীর হাতের ব্যান্ড মেরুন ও হলুদ রঙের এবং এর মাঝে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, ১৯৭১! 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরির মূল দায়িত্বে ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ। ১৯৭০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল

হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৬ নম্বর কক্ষে 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'-এর সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকার নকশা চূড়ান্ত করেন কাজী আরেফ। 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য হিসেবে তিনি এ কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকার অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ।

লেখা ছিল '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী'। গলায় মেরুন ও হলুদ রঙের স্কার্ফ। এই বাহিনী আজিমপুর গোরস্তানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরের মাজারে অভিবাদন ও পুষ্পমাল্য দিয়ে শহর প্রদক্ষিণে বের হয়। মিছিলের প্রথমে ছিলেন সাবেক ঢাকা শহর সভাপতি মফিজুর রহমান খান। এরপর ছিলেন হাসানুল হক ইনু, মনিরুল হক চৌধুরী (পরে বিএনপির এমপি), মনিরুল হক (সভাপতি, ঢাকা শহর ছাত্রলীগ) ও শেখ হাসিনা (সভানেত্রী, আওয়ামী লীগ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী)। প্রত্যেককেই সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরতে হয়েছিল। মেয়েরা সাদা শাড়ি পরে মিছিলে যোগ দিয়েছিল। এই মিছিলে তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ সামনের সারিতে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭০-এর ৭ জুন, ছয় দফা দিবসে (১৯৬৬-এর যে দিনটিতে মনু মিয়া শহীদ হন) ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবকে অভিবাদন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেদিন ছাত্রলীগও সিদ্ধান্ত নেয় যে একটি বাহিনী গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। এবারও 'নিউক্লিয়াস' এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয় 'জয় বাংলা বাহিনী'। অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় আ স ম আবদুর রবকে। 'নিউক্লিয়াস' থেকে বাহিনীর পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পতাকা বঙ্গবন্ধুকে ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ হিসেবে প্রদান করা হবে। ৬ জুন '৭০-এ ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৬ নম্বর রুমে মনিরুল ইসলাম, শাজাহান সিরাজ ও আ স ম আবদুর রবকে ডেকে আমি 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্ল্যাগ তৈরির কথা জানাই। এই ফ্ল্যাগ পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানাই। তখন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) ও আ স ম আবদুর রব বলেন যে, এই পতাকার জমিন অবশ্যই

বটলগ্রিন হতে হবে। শাজাহান সিরাজ বলেন যে, লাল রঙের একটা কিছু পতাকায় থাকতে হবে। এরপর আমি পতাকার নকশা তৈরি করি- বটলগ্রিন জমিনের ওপর প্রভাতের লাল সূর্যের অবস্থান। সবাই একমত হন। তারপর পতাকার এই নকশায় 'নিউক্লিয়াস' হাইকমান্ডের অনুমোদন নেওয়া হয়। তখন আমি প্রস্তাব করি যে এই পতাকাকে পাকিস্তানি প্রতারণা থেকে বাঁচাতে হলে লাল সূর্যের মাঝে সোনালি রঙের মানচিত্র দেওয়া উচিত। কারণ হিসেবে দেখালাম যে, প্রায়ই বাংলাদেশের ন্যায়সংগত আন্দোলনকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'ভারতের হাত আছে' বা 'ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ হচ্ছে' অথবা 'ভারতীয় এজেন্টদের কার্যকলাপ' বলে প্রচারণা চালায়। তাছাড়া এই সময় 'ইউনাইটেড স্টেটস অব বেঙ্গল' বা 'বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র' নামের কাল্পনিক একটি দেশের জন্ম দেওয়া হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ পূর্ব পাকিস্তান ও মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যসহ এই কল্পিত 'ইউনাইটেড স্টেটস অব বেঙ্গল' এর মানচিত্র তৈরি করে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তা বিলি করত। এই ধরনের প্রচারণা থেকে পতাকাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সোনালি আঁশ ও পাকা ধানের রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র পতাকার লাল সূর্যের মাঝে রাখার আমার এই প্রস্তাবে সবাই একমত হন। 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পতাকা তৈরির এসব কাজ করা হয়।

পতাকার কাপড় কিনে তৈরি করতে পাঠানো হয় কামরুল আলম খান খসরু, স্বপন কুমার চৌধুরী, মনিরুল হক, হাসানুল হক ইনু ও শহিদ নজরুল ইসলামকে। খসরু নিউমার্কেটের অ্যাপোলো নামক দোকান থেকে গাঢ় সবুজ ও লাল রঙের লেডি হ্যামিলটন কাপড় কিনে বলাকা বিল্ডিংয়ের 'পাক ফ্যাশন' থেকে তৈরি করায়। যে দর্জি এই পতাকা তৈরি করেন তিনি ছিলেন অবাঙালি এবং ইতিবৃত্ত না জেনেই এই পতাকা তৈরি করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছর পর ওই দর্জি পাকিস্তানে চলে যান।

সমস্যায় পড়লাম মাঝের সোনালি মানচিত্র আঁকা নিয়ে। এ সময় কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাশ (স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য) ইকবাল হলে এসে উপস্থিত হন। তিনি জানালেন মানচিত্রের ওপর শুধু রং করতে পারবেন, মানচিত্র আঁকতে পারবেন না। তখন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

হাসানুল হক ইনু ও ইউসুফ সালাহউদ্দীন আহমদ চলে গেলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এনামুল হকের ৩১২ নম্বর কক্ষে। তার কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা হলো বাংলাদেশের মানচিত্র। সোনালি রং কিনে আনা হলো। শিবনারায়ণ দাশ ট্রেসিং পেপার থেকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে লাল বৃত্তের মাঝে আঁকলেন মানচিত্র। মানচিত্রের ওপর দিলেন সোনালি রং। শিবুর কাজ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়েই একটা ভবিষ্যতের নতুন দেশের নতুন পতাকার জন্ম হলো।

সেই রাতেই এই পতাকার সার্বিক অনুমোদনের জন্য 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠক হয় ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর কক্ষে। বৈঠকে পতাকাটি অনুমোদিত হলো। এবার বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনের কাজটি বাকি থাকল। রাজ্জাক ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে অনুমোদন আদায় করার। রাজ্জাক ভাই সেই রাতেই (৬ জুন) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুমোদন গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তবে তাকে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। পরদিন ৭ জুন ভোর থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাংলাদেশের 'প্রথম পতাকা' পলিথিনের কাগজে মুড়িয়ে আমি পল্টন ময়দানে গেলাম। কর্দমাক্ত পল্টন ময়দানে যথাসময়ে 'জয় বাংলা বাহিনী' এগিয়ে আসল। সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় বটলগ্রিন ও লাল কাপড়ের লম্বা ক্যাপ ও হাতে লাল-সবুজ কাপড়ের ব্যান্ডে লেখা 'জয় বাংলা বাহিনী'। ডায়াসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দাঁড়িয়ে; সাথে আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদ। তার ডান পাশে আমি পলিথিনে মোড়ানো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আ স ম আবদুর রব ডায়াসের সামনে এসে অভিবাদন দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে 'ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ' নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে পতাকা নিয়ে খোলা অবস্থায় উপস্থিত জনতাকে দেখিয়ে রবের হাতে তুলে দেন। রব এই 'ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ' সামরিক কায়দায় গ্রহণ করে। পরে মার্চ করে এগিয়ে যায়। 'জয় বাংলা বাহিনী' বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ 'পতাকা' নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে ইকবাল হলে ফেরত যায়।

পতাকাটি তৎকালীন ঢাকা শহর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেনের কাছে রক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে ২ মার্চ '৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় লক্ষাধিক লোকের সামনে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'র সভায় আ স ম আবদুর রব কলাভবনের পশ্চিম প্রান্তের

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পতাকাটি প্রদর্শন করেন। এই পতাকাই পরদিন (৩ মার্চ) পল্টন ময়দানে শাজাহান সিরাজের 'স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ'-এর জনসভায় উত্তোলন করা হয়। ওই মঞ্চে বঙ্গবন্ধুও উপস্থিত ছিলেন।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে 'জয় বাংলা' বাহিনী আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যায়। এই দিন 'জয় বাংলা বাহিনী'কে ৪টি প্লাটুনে ভাগ করে ৪ জন প্লাটুন কমান্ডারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেদিন 'জয় বাংলা বাহিনী'র অভিবাদন গ্রহণ করেন আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, কামালউদ্দিন (পরে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অফিসার) ও মনিরুল হক (ঢাকা শহর ছাত্রলীগ সভাপতি)। পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তে কামরুল আলম খান খসরুর হাতের ৭ এমএম রাইফেল থেকে ফাঁকা গুলি করে শব্দ করা হয়। খসরুর পাশে হাসানুল হক ইনু পতাকাটি হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে দাঁড়িয়েছিলেন।

এখান থেকেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে তার হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়। তার বাসায় ও গাড়িতে দুটি পতাকা ওড়ানো হয়। এই পতাকাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার অনুমোদন করেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পতাকার লাল বৃত্তের ভেতরের বাংলাদেশের সোনালি রঙের মানচিত্র উঠিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের সময় তিনি বিখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান সাহেবের পরামর্শ নেন। আজ একটি ভুল ইতিহাস দাঁড় করানোর প্রবণতা চলছে। পতাকার নকশাকারক হিসেবে কামরুল হাসান সাহেবের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই সত্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে ভুল তথ্য সাময়িক জায়গা পেলেও কালের স্রোতে তা ধুয়ে মুছে হারিয়ে যায়। প্রসঙ্গত কারণে বলে রাখা প্রয়োজন যে, সে সময় যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সিদ্ধান্তের অনুমোদন সিরাজুল আলম খানকেই দিতে হতো।

কাজী আরেফ আহমেদ
(নিউক্লিয়াস-এর সদস্য, জাতীয় পতাকার অন্যতম প্রধান রূপকার)

৭ই জুন : পতাকায় মানচিত্র

মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি)

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র বই থেকে সংকলিত অংশঃ পৃষ্ঠা ১২৬ -১৩০]

'৭০ সালের শুরুতেই বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলার একচ্ছত্র কর্তৃত্বে অধিকারী আওয়ামী লীগ সর্বজনস্বীকৃত। অপেক্ষা শুধু একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আইনি স্বীকৃতি লাভ করা। '৬৯ সাল জুড়ে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম মুজিব আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত। দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। ৪ জুন সে দলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল। স্বাভাবিকভাবে একে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা ব্যাপক আলোচনার সূচনা ঘটে। মে মাসে কামাল হোসেন এবং ২ জুন '৬৯-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা তরুণ নেতা তোফায়েল আহমেদের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের যোগদানে কাউন্সিল অধিবেশনের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আরো আকর্ষিত হয়েছে। ৪ জুন মতিঝিলে ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় কোটায় ২৫ জন কাউন্সিলর মনোনীত করা হয়। মওলানা তর্কবাগীসের সঙ্গে '৬৯ এর আন্দোলনের নেপথ্যে নায়ক সিরাজুল আলম খানকে কাউন্সিলের মনোনীত করা হয়। দীর্ঘদিন প্রচারণার বাইরে থেকে, সুদীর্ঘ পলাতক জীবনের নৈপথ্যচারী এই লোকটি ইতিমধ্যে রহস্য পুরুষের ইমেজে পরিণত হন। আওয়ামী রাজনীতিতে রাজপুটিন খ্যাত এই ব্যক্তির হঠাৎ করে কাউন্সিলর হওয়ায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রতি রাজনৈতিক কর্মীদের উৎসুক্য অনেক বেড়ে যায়। ফলে এ কাউন্সিল উপলক্ষে বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ ত্যাগকারী অনেকেই যেমন দলে ফেরেন, তেমনি সামনে নির্বাচনে রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করে দলের মাঝে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও প্রতিযোগিতা জোরদার হয়। শেখ মুজিব একটি বিশ্বাসে থাকলেও দলের মাঝে বহু মতের চর্চাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত

করতেন। এতে দলে রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে আন্দোলনের বহু পথ খোলা থাকে বলে বিবেচনা করা হতো।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকল মতের অনুসারীদেরই সারা দেশ থেকে আগত ডেলিগেটদের সামনে নিজে নিজে বিশ্বাসের রাজনীতি তুলে ধরার প্রয়াস দেখা যায়, আলাপ-আলোচনা ছাড়াও বিভিন্নভাবে তা প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ৬ দফাকে কেন্দ্র করে এই সময় তিনটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে আসে। কেউ ৬ দফাকে পাকিস্তান ফেডারেশনের শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি হিসাবে বিবেচনা করে। আবার কেউ বিশ্বাস করে ৬ দফা বাস্তবায়িত করতে হলে পাকিস্তান ফেডারেশনে না থেকে এক কনফেডারেশনে পরিণত হবে। ফলে কনফেডারেশনের পক্ষে মতামত গড়ে তোলার জন্য রাজনীতি পরিচালিত করাকে বিশেষ বিবেচনায় আনতে চেষ্টা করে। এই মতদ্বয়ের বাইরে আরেকটি মত বেশ প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়। যারা মনে করে ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির পূর্ব প্রস্তাব। পাকিস্তানি সামন্ত আবহের সামরিক চক্র ও বেসামরিক আমলাদের গাঁট বন্ধন পূর্ব বাংলাকে কোনো অবস্থাতেই ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে দেবে না বিধায় ছয় দফাকে অবজ্ঞা করবে এবং প্রস্তুত হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার ক্ষেত্র। এই মতের বিশ্বাসীরা স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রে প্রগাঢ়ভাবে আস্থা রাখে। আওয়ামী লীগ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে স্বীয় চিন্তাভাবনার পক্ষে একটি মহড়া প্রদর্শন জরুরি মনে করে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ থেকে আগত কাউন্সিলর ডেলিগেটরা কাউন্সিলের কতগুলো রাজনৈতিক নির্দেশনাসহ প্রস্তাবের সঙ্গে ভবিষ্যতে কার্যক্রমের একটা ভাবনাসহ পরিপূর্ণ চিত্র যেন পায় সে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলকে উপলক্ষ করে '৬ দফা না স্বাধীনতা' এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা এবং সারাদেশের ডেলিগেটদের মাধ্যমে কর্মী-সমর্থকদের কাছে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির মর্মবাণী পৌঁছানোর জন্য স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা কর্মসূচির অবতারণা করে। সে লক্ষ্যে এই মতাবলম্বীরা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংগঠন শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগের তরফ থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে ৭ জুন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাউন্সিলে ভবিষ্যৎ নির্বাচনকে ৬ দফা তথা আওয়ামী লীগের পক্ষে ম্যান্ডেট গ্রহণের জন্য এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা পূর্ব থেকে জানা ছিল বলে এদের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটা

ধারণা তুলে ধরা। ৭ জুন পল্টন ময়দানে শ্রমিক লীগ সমাবেশের কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেখানে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা সংগঠিতভাবে উপস্থিত হয়ে শেখ মুজিবকে অভিবাদন জানাবে। শ্রমিক লীগের সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন ব্যানারের সঙ্গে ৬ দফার প্রতি তাদের সমর্থন তুলে ধরা হবে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ কোনো শাসনতন্ত্র ৬ দফা, ১১ দফাকে পাশ কাটিয়ে হলে তা প্রতিহত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করবে। এই সমাবেশে ছাত্রলীগ সুসজ্জিতভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে অভিবাদন জানিয়ে তাদের প্রত্যয় ঘোষণা করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে সারাদেশের কর্মী সমর্থকদের মাঝে সুশৃঙ্খল রণমুখি একটা মনোভাব গড়ে ওঠার ইঙ্গিতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এই লক্ষ্যে ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্য থেকে একটা স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলা হয়। যাদের পরিচয় হবে 'জয় বাংলা বাহিনী'র একটি ব্যাটালিয়ন হিসাবে। বেশ কিছুদিন ধরে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে একটি মহড়া দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়।

সুসজ্জিত সাধারণ র‍্যালি না করে রণমুখি ধারণা-বিন্যাসের প্রয়োজনে পোশাক থেকে শুরু করে একটা কুচকাওয়াজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের পোশাকের রং সাদা করা হয়। ছেলেদের প্যান্ট-শার্ট এবং মেয়েদের জন্য সালোয়ার কামিজ অথবা শাড়ি নির্ধারণ করা হয়। সবার জন্যই সাদা কাপড়ের জুতা, মাথায় পরার জন্য একটা টুপি তৈরি করা হয়। টুপিটা অনেকটা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সামরিক পোশাকের সঙ্গে ব্যবহৃত টুপির সাদৃশ্যে করা হয়। তবে টুপির রং হয় কালচে সবুজ এবং নিচের দিকে টকটকে লাল রঙের একটা মোটা ফিতার মতো পট্টি। টুপির সামনে গোল করে বসানো হলুদের মাঝে 'জয় বাংলা' লেখা, যা টুপির সঙ্গে সেফটি পিন দিয়ে আটকান। ওই টুপি দিয়েই 'জয় বাংলা বাহিনী'র একটা প্রতীকী রং দেওয়া হয়। (কাপড় দিয়ে তৈরি এই কয়েক হাজার টুপি তৈরি করে দেয় নিউ মার্কেটের ১ নম্বর গেইটের পশ্চিমের দিকে এক দরজির দোকান। ওই দোকানের মালিক ছিল প্রয়াত ওবায়দুর রহমানের ভাই হাবিবুর রহমান।) ছাত্রলীগ থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজের মহড়ার প্রায় পুরোটাই হয় বর্তমান জহুরুল হক হলের খেলার মাঠে। এ অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কুচকাওয়াজে বাদন দল সংযোজন করা হয়। উদ্দেশ্য শহরের পথ দিয়ে যাওয়ার সময়

জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং জনতার মাঝে ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দেওয়া। ৭ জুন পল্টনে চূড়ান্ত প্রদর্শনীর আগের দিনে বাদন দলের যন্ত্রীদের আরও জাঁকজমকপূর্ণ করার কথা ভাবা হয়। সে উদ্দেশে টুপির রঙের সঙ্গে মিল রেখে সংগৃহীত কাপড় দিয়ে কালচে সবুজ কিনারায় লাল রঙের পট্টি দেওয়া এক খণ্ড কাপড় প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রীর পিঠে ঝোলানোর ব্যবস্থা করা হয়। চূড়ান্ত মহড়া ৬ জুন বিকালে শেষ হয়। ওই দিনই সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত হয় জয় বাংলা বাহিনীর একটা পতাকা তৈরির বিষয় যা পরদিন (৭ জুন) সকালের অনুষ্ঠানকে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করবে। সে অনুযায়ী বাদন দলের বাড়তি সৌন্দর্যের জন্য সংগৃহীত কাপড় থেকে একটা পতাকা তৈরি হয়। কালচে সবুজ জমিনের ঠিক মধ্যখানে পরিমিত আকারে একটা লাল বৃত্ত। (পতাকাটি বলাকা ভবনের ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় অফিসের পাশের এক দরজির দোকান 'পাক ফ্যাশন' থেকে সেলাই করে নেওয়া হয়)। পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত ও পতাকা তৈরি পর্যন্ত কাজী আরিফ (আরেফ) ছাড়া উচ্চ পর্যায়ের কারও অনুমতি গৃহীত হয়নি। কিন্তু পরদিন একটা পতাকা, তা যে নামেই হোক, প্রদর্শনের আগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ছাত্রলীগের ৭ জুন পালনের সকল কার্যক্রম তখন জহুরুল হক হলের নিচতলার ১১৬ নম্বর কক্ষ থেকে পরিচালিত হচ্ছিল। ওই হলেই তিনতলার একটি কক্ষে সিরাজুল আলম খান প্রায়ই থাকতেন। স্বভাবতই স্বাধীনতার কার্যক্রমের একজন ঊর্ধ্বতন নেতা হিসেবে তার কাছে অনুমোদন নিতে যাওয়া হলো। তিনি পতাকা তৈরি ছাড়া আর সকল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকায় আগামীকালের কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ করার জন্য পতাকা তৈরির কথা জানিয়ে তা প্রদর্শনের জন্য তার অনুমতির জন্য আবেদন করা হলো। সমস্ত কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'যে নাম দিয়েই পতাকা প্রদর্শন করো না কেন তাকে জনগণের ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বলে ভেবে নিতে কোনো বাধা থাকবে না।' এই মুহূর্তে 'বাংলাদেশ' ও 'বাঙালি' নিয়ে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, 'বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাবিষয়ক আন্দোলনকে অনেকেই যুক্ত বাংলার কথা বলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই বিরুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে।' অনেক আলোচনার পর তিনি লালবৃত্তের মাঝে পূর্ব বাংলার মানচিত্র এঁকে প্রদর্শনের পক্ষে মত দিলেন। সোনার বাংলার প্রতিচিত্র সুস্পষ্ট করতে তিনি ওই মানচিত্র সোনালি রংয়ে

আঁকার পক্ষে মত দিলেন। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে ৬ জুনের রাতের দ্বিতীয় প্রহরের প্রায় শেষ প্রান্ত উপস্থিত। বলাকা ভবনে ছাত্রলীগ অফিস হওয়ার কারণে নিউ মার্কেটের পাশের কাঁচা বাজার সংলগ্ন এক রঙের দোকান থেকে দোকানিকে জাগিয়ে সোনালি রং ও তুলি জোগাড় করা হলো। মানচিত্রের নকশা অঙ্কন এবং রং করার জন্য একজন শিল্পীর প্রয়োজন দেখা দিল। সে সমস্যাও সহজেই সমাধান হয়ে গেল। সলিমুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের সম্মেলন উপলক্ষে ব্যানার আঁকার জন্য কুমিল্লা ছাত্রলীগের নেতা শিবনারায়ণ দাশ তখন কর্মরত ছিল। সে একজন ভালো শিল্পীও বটে। ফলে তাকে নিয়ে আসা হলো কালচে সবুজ জমিনের মধ্যখানে লাল বৃত্তের মাঝে সোনালি রং দিয়ে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকার জন্য। ১১৬ নম্বর কক্ষের মেঝেতে বিছিয়ে লাল বৃত্তের মাঝে পূর্ব বাংলার সোনালি মানচিত্র আঁকা হলো। পরদিন ৭ জুন সকালে আবহাওয়া মেঘলা থাকায় এবং পতাকার আবেগ বেশি মাত্রায় অনুভব করায় এটিকে প্রদর্শিত করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ছোট লাঠিতে পেঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবা হয়। জহুরুল হক হল থেকে শুরু হয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলে বাদনের তালে তালে কুচকাওয়াজ দল। পল্টন ময়দানে শ্রমিক লীগের সমাবেশ র‍্যালি থাকলেও ছাত্রলীগের এই পদক্ষেপ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রলীগের বাহিনীটি মঞ্চে দণ্ডায়মান শেখ মুজিবকে অভিবাদন জানাতে কুচকাওয়াজ করে মঞ্চের কাছে যায়। মঞ্চের কাছে গিয়ে রাতে তৈরি পতাকাটি তৎকালীন ডাকসু সহসভাপতি আ স ম রব শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেন। শেখ মুজিব পতাকাটা খুলে দেখেই পাশে কার হাতে দিয়ে দেন। এই সেই পতাকা যা '৭১ সালের ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে আকাশে তুলে ধরা হয়।

'৭ জুন' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে আগত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের অধিবেশনের বাইরে যে বার্তাটি দেওয়া প্রয়োজন তা সম্পন্ন হয়। সেদিনের '৭ জুন' উদ্‌যাপনের এ অনুষ্ঠানকে আজকের প্রেক্ষাপটে দেখলে কারও কারও কাছে বালখিল্য মনে হতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে সারা দেশের আওয়ামী লীগ রাজনীতির কর্মী-সমর্থকদের কাছে একটা সুনির্দিষ্ট বার্তা পৌঁছে গেছে। ৬ দফা শুধু যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি নয়, বরং স্বাধীনতারই এক পূর্ববর্তী অবস্থার দাবি তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৬ দফা যারা শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি বলে

প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছিল, দলের মাঝে তাদের অবস্থান ক্রমশই নড়বড়ে হয়ে পড়ছিল। তবু নির্বাচন সামনে থাকায় তখনও তারা কিছুটা হালে পানি পাচ্ছিল। ক্ষমতা দখলের মাধ্যম কিংবা পূর্ব বাংলার জনগণের গণরায় উভয় প্রয়োজনে নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ও সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ থাকলেও সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের সামনে তাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট। যে লক্ষ্য ততক্ষণে এদেশের সংগ্রামী জনগণের প্রাণের স্পর্শে গণদাবিতে পরিণত প্রায়। শুধু পাকিস্তানের কাঠামোতে একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে বলে ততটা প্রকাশ্য উচ্চারণ করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের ছাত্র-যুবসমাজ আন্দোলন সংগ্রামের কৌশল বিষয়ে এতই আত্মনির্ভর যে বহু রাজনৈতিক বিতর্ককে তোয়াক্কা না করেই এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ছাড়াও আরো দু-একটি দল সমর্থন জানিয়ে আসন্ন নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবি করে আসছিল। কিন্তু কাউন্সিল সে দাবি নাকচ করে দিয়ে এককভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়; তবে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ খোলা রাখে। এটা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়ে নিজেদের অবস্থান ভালো করার চেষ্টা চালায়। তাদের আশা ছিল বাংলাদেশের সচেতন ছাত্র-যুবসমাজ কিছুটা হলেও তাদের প্রতি ঝুঁকবে। স্বাধীনতার পক্ষের কর্মীদের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে তা ব্যর্থ হয়। ওই মুহূর্তে বাংলাদেশের ৮০ ভাগ ছাত্র-যুবসমাজ আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন আরো জোরদার করে। ততদিনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ৬ দফা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ধারার উন্মেষ ঘটে গেছে। বহু ধারার রাজনীতির সম্মিলনের সংগঠন আওয়ামী লীগের মাঝে সে বিকাশের ছবি সুস্পষ্ট। আর এসবই হয়েছে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি শেখ মুজিবের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পরোক্ষ সহযোগিতায়। ফলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু কিছু কারও কারও কাছে কাকতালীয় মনে হলেও তা ছিল সুপরিকল্পিত প্রয়াসেরই ফসল।

মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি)
(নিউক্লিয়াস-এর সদস্য, পতাকার অন্যতম রূপকার, তৎকালীন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি)

জাতীয় পতাকা সার্বভৌমত্বের প্রতীক

আ স ম আবদুর রব

পতাকা ব্যবহারের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। যুদ্ধবিগ্রহে, পক্ষে-বিপক্ষে পতাকা ব্যবহৃত হতো। আজকের বিশ্বে প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি পতাকা আছে, যা জাতীয় পতাকা হিসেবে বিবেচিত। পতাকা হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এই পতাকা অর্জনের জন্যই যুগে যুগে আন্দোলন-সংগ্রাম, সশস্ত্র যুদ্ধ, আত্মবলিদান করতে হয়েছে। বাঙালি জাতিও তার আত্মপরিচয়ের পতাকা অর্জনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান এবং পরিশেষে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়ে অগণিত জীবন উৎসর্গ করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি হয়েছিল।

১৯৭০ সালের ৭ জুন, ছয় দফা দিবস বা মনুমিয়া দিবসে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক সমাজের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, একটি বাহিনী গঠন করে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হবে। সেই বাহিনীর নাম দেওয়া হয় 'জয়বাংলা' বাহিনী। জয়বাংলা বাহিনীর অধিনায়ক আমাকে (আ স ম আবদুর রব) ও সহ অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় কামরুল আলম খান খসরুকে। নিউক্লিয়াস হাইকমান্ড সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৭০ সনের ৬ জুন সন্ধ্যায় ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৬ নম্বর কক্ষে মনিরুল ইসলাম, কাজী আরেফ, শাজাহান সিরাজ ও আমি (আ স ম আবদুর রব) পতাকা তৈরির জন্য বৈঠকে বসি। তখনই সিরাজুল আলম খানের নির্দেশ ও পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলা হয়, জয়বাংলা বাহিনীর এই ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগই পরবর্তীতে জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকার সম্মান অর্জন করবে এবং এটিই জাতীয়

পতাকা হিসেবে গৃহীত হবে। বৈঠকে পতাকার জমিন বটল গ্রিন হতে হবে– আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করি, মনিরুল ইসলামও পতাকার জমিন সবুজ রাখার প্রস্তাব দেন। শাজাহান সিরাজ বলেন, লাল রঙের একটা কিছু পতাকায় থাকতে হবে। তারপর কাজী আরেফ বটল গ্রিন জমিনের মাঝখানে প্রভাতের লাল সূর্যের অবস্থান এঁকে সবাইকে দেখান। পরবর্তীতে নিউক্লিয়াস হাইকমান্ড সিরাজুল আলম খানের অনুমোদনের সময় কাজী আরেফ কৌশলগত কারণে লাল সূর্যের মাঝে সোনালি রঙের মানচিত্র দেওয়া উচিত বলে প্রস্তাব করেন। নিউক্লিয়াসের সিদ্ধান্ত এবং সিরাজুল আলম খানের অনুমোদনে এভাবেই পতাকার পরিকল্পনা হয়।

পতাকা তৈরির জন্য কামরুল আলম খান খসরু কাপড় কিনে নিউমার্কেটের অ্যাপোলো নামক দোকান থেকে সেলাই করে আনেন। সমস্যা দেখা দেয় সোনালি মানচিত্র আঁকা নিয়ে। কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাসকে ইকবাল হলে ডেকে আনা হয়। তিনি জানালেন মানচিত্র আঁকতে পারেন না, শুধু রং করতে পারেন। তখন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাসানুল হক ইনু ও ইউসূফ সালাহউদ্দীন আহমেদ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এনামুল হকের কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা হয় বাংলাদেশের মানচিত্র। এই মানচিত্রের উপর শিবনারায়ণ দাশ দিলেন সোনালি রঙ। এভাবেই জন্ম হয় নতুন পতাকার। সেই রাতেই নিউক্লিয়াসের বৈঠকে পতাকাটি অনুমোদিত হয়। পতাকা তৈরির পুরো কাজটি হয়েছিল খুবই গোপনে এবং জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকায় ভিন্ন ভিন্ন অংশে যুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের কথা উল্লেখ করে সিরাজুল আলম খান বলেছেন– কাজী আরেফসহ ২২ জন সদস্য পতাকা তৈরির কাজে অংশ নেন। তারা হলেন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি), আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কামরুল আলম খান খসরু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু, ইউসূফ সালাহউদ্দীন আহমেদ, স্বপন কুমার চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস, রফিকুল ইসলাম (লিটল কমরেড), আব্দুল্লাহ সানি, এনামুল হক, শিবনারায়ণ দাশ, মনিরুল হক, নজরুল ইসলাম, শেখ সহিদুল ইসলাম, চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান, মইনুল ইসলাম চৌধুরী আজাদ, গোলাম ফারুক, জিন্নাত আলী ও শেখ মোঃ জাহিদ।

কালস্রোতে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর সরকারি সিদ্ধান্তে পতাকার লাল সূর্যের মাঝে সোনালি মানচিত্র বাদ দেওয়া হয়। কামরুল হাসান কর্তৃক পতাকার মাপ স্ট্যান্ডারাইজড করাকে পতাকার ডিজাইন হিসেবে বর্ণনা করা শুরু করে। বাংলা একাডেমির বইপুস্তকেও এই জাতীয় বক্তব্য চোখে পড়েছে যা অনাকাঙ্ক্ষিত। শিবনারায়ণ দাশকে পতাকার নকশাকার বা রূপকার হিসেবে উল্লেখ করতে পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। এই জাতীয় বক্তব্য সত্যের অনেক দূরবর্তী এবং ইতিহাসনির্ভর নয়। শিবনারায়ণ দাশ ছাত্রলীগের সংগঠক হিসেবে পতাকার মানচিত্রটুকু রং দিয়ে অঙ্কন করেছেন। এটার অবশ্যই ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। পতাকার বটল গ্রিন জমিন, মাঝখানে সূর্য, সূর্যের মাঝে সোনালি মানচিত্র– এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিউক্লিয়াসের অনুমোদনের পর নতুন করে নকশাকার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা পরিকল্পনায় শিবনারায়ণ দাশের যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আশা করি ভবিষ্যতে পতাকার নকশাকার বা রূপকার নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান হবে। ইতিহাসে যতটুকু প্রাপ্য তাই সম্মানজনক। ইতিহাসে কারও অবদান বৃদ্ধি করা যায় না বা খর্ব করা যায় না। ইতিহাসকে খণ্ডিত করা বা বিকৃত করা কোনো নৈতিক কাজ নয়।

পতাকা তৈরির সিদ্ধান্তের পর একেক জন একেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেমন কাপড় জোগাড় করা, সবুজ জমিনের মধ্যে লাল বৃত্ত সেলাই করা, অ্যাটলাস পেপার ট্রেসিং ও রং যোগাড় করা, মানচিত্র অঙ্কন করা ইত্যাদি। তৎকালে আমরা স্বাধীনতার চেতনায় শাণিত ছিলাম। কোনো সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও টিম ওয়ার্ক ছিল। যার কারণে অতি দ্রুত পতাকা তৈরি সম্ভব হয়।

এই পতাকাই ৭ জুন জয়বাংলা বাহিনী গার্ড অফ অনার-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া হয় এবং আমি (আ স ম আবদুর রব) সামরিক কায়দায় বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে ব্যাটেলিয়ন ফ্ল্যাগ গ্রহণ করি। জয়বাংলা বাহিনী ভবিষ্যৎ জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে। এই পতাকা তৎকালীন ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেনের কাছে রক্ষিত থাকে। ২ মার্চ, '৭১ এই পতাকাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জনতার সমাবেশে মিছিল সহকারে জাহিদ হোসেন নিয়ে আসে।

২ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতার সমাবেশে ডাকসুর ভিপি হিসেবে আমি আ স ম আবদুর রব স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি এবং উল্লেখ করি, এই পতাকাই আজ থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা। পতাকা উত্তোলন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। পতাকা উত্তোলনের সময় অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিল। বাঁধভাঙা জনস্রোত সেদিন পতাকার পিছনে শামিল হয়েছিল। পতাকা উত্তোলনের সময় লক্ষ লক্ষ জনতা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে জাতীয় পতাকাকে স্বাগত জানায়। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সামরিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন কোনো ব্যক্তির কৃতিত্ব নয়, এটি সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এ গৌরবে ছাত্রলীগ যেমন অংশীদার, তেমনি স্বাধীনতা উন্মুখ বাঙালি জাতিও অংশীদার।

৩ মার্চ নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে শাজাহান সিরাজের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠের জনসভায় এই পতাকাটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হয়। ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীন 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। জয়বাংলা বাহিনী মার্চ পাস্টের মাধ্যমে সোনালি মানচিত্রখচিত লাল সবুজর পতাকাকে অভিনন্দন জানায়। কামরুল আলম খান খসরু রাইফেলের গুলিতে মার্চ পাস্ট উদ্বোধন করেন এবং পতাকা উত্তোলন করেন হাসানুল হক ইনু। কুচকাওয়াজ মঞ্চে সালাম গ্রহণ করেন স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। জয়বাংলা বাহিনীর সঙ্গে মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে প্রীতিলতা বাহিনীও গঠন করা হয়েছিল। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা ইতিহাসের অনেক জায়গা দখল করে আছে।

মার্চপাস্টের পর সারা শহর প্রদক্ষিণ করে আমরা বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িতে উপস্থিত হই। পথে পতাকা বহন করছিলেন প্রীতিলতা বাহিনীর শামসুন নাহার ইকো। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে পৌঁছে শামসুন নাহার ইকোর হাত থেকে পতাকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তুলে দিই। বঙ্গবন্ধু পতাকা তুলে ধরে জনতার সামনে প্রদর্শন করেন। তারপর আমরাই বঙ্গবন্ধুর গাড়ি ও বাসভবনে

পতাকা উত্তোলন করে দিই। এই পতাকাই অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উড়তে থাকে। এই পতাকা হাতে নিয়েই মুক্তিযোদ্ধাগণ জয়বাংলা স্লোগানে উদ্দীপ্ত হতো, এই পতাকা দিয়েই কফিন জড়িয়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জাতির সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা হতো।

৬ জুন, ২০২৪
উত্তরা, ঢাকা।

আ স ম আবদুর রব
(নিউক্লিয়াস সদস্য, পতাকার অন্যতম রূপকার, তৎকালীন ডাকসুর সহ-সভাপতি)

পতাকার কথা

শাজাহান সিরাজ

[‘*ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ*’ নামক ৪ পাতার পত্রিকা থেকে শাজাহান সিরাজের লেখা সংকলিত। এই পত্রিকার প্রকাশক ‘স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম স্মৃতি পরিষদ’। প্রকাশের কোনো তারিখ উল্লেখ নেই। ‘স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম স্মৃতি পরিষদ’ এর সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। শাজাহান সিরাজের পারিবারিক সূত্র জানিয়েছেন এই বুলেটিনের সম্ভাব্য প্রকাশককাল ফেব্রুয়ারি/ মার্চ ২০১১।]

১৯৬২ সালে ছাত্রলীগের তাত্ত্বিক নেতা স্বাধীনতার অন্যতম রূপকার সিরাজুল আলম খান (দাদা) এর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের লিবারেশন ফ্রন্টের একটি কোষ। এই কোষে ছিল আরো দুই জন। ছাত্র নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও ছাত্র নেতা কাজী আরেফ আহমেদ। ১৯৬৮ সালে বিএলএফ-এর এই কেন্দ্রীয় কোষে যুক্ত হলো আ স ম রব, শাজাহান সিরাজ, মনিরুল ইসলাম মনি (মার্শাল মনি) ও আমিনুল হক বাদশা। বিএলএফ-এর এই গোপন কোষের মাধ্যমেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা ছাত্রলীগের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে প্রকাশ করা হতো। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূলে ছিল বিএলএফ-এর কেন্দ্রীয় কোষ। আওয়ামী লীগ, শ্রমিকলীগের মধ্যেও বিএলএফ-এর কাজ কার্যক্রম করা হতো অতি গোপনে। ১৯৭০ সালের বিএলএফ-এর এই কেন্দ্রীয় কোষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’ নামে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কয়েক হাজার কর্মীদের নিয়ে গঠন করা হয় ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’। একই ধরনের সাদা পোশাক, ব্যাচ, টুপি পরিধান করে ’৭০-এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আজিমপুর কবরস্থানে

সার্জেন্ট জহুরের মাজারে নূরে আলম সিদ্দিকী (ছাত্রলীগের সভাপতি), শাজাহান সিরাজ (ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক), আ স ম আব্দুর রব (ডাকসুর ভিপি) ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন (জি এস, ডাকসু) এর নেতৃত্বে মার্চপাস্ট করে জহুরুল হক হল চত্বর থেকে ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’ মাজার গিয়ে সামরিক কায়দায় সেলুট দেয়। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা অংশগ্রহণ করেন। মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় আজিমপুর কবরস্থান। ‘জহুরের রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্র’, ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো’, ‘জয়বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু’। বিএলএফ-এর কেন্দ্রীয় কোষের প্রধান কাজ ছিল কীভাবে ছয় দফা আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত করা যায় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সামনে আসল ৭ জুন ৬ দফা দিবস। ১৯৬৬ সালে ৭ জুন আওয়ামী লীগের ডাকে আহুত হরতালে শহীদ হন মনু মিঞাসহ অনেক শ্রমিক। রক্তাক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৭ জুন ৬ দফা দিবস। ৬ দফা দিবসকে কীভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকাশ্য রূপ দেওয়া যায় তার সিদ্ধান্ত হলো বিএলএফ-এর বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হলো বঙ্গবন্ধুকে প্রধান অতিথি করে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠান করার। ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’র নাম পরিবর্তন করে ‘জয়বাংলা বাহিনী’ নামকরণ করা হলো। ছাত্রলীগের হাজার হাজার ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘জয়বাংলা বাহিনী’। বঙ্গবন্ধুকে রাজি করানো হলো ৭ জুন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য ‘জয়বাংলা বাহিনী’র অভিবাদন গ্রহণ করার কর্মসূচিতে।

‘জয়বাংলা বাহিনী’র সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। ৬ জুন রাত ১১টায় বিএলএফ-এর আ স ম রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ, মার্শাল মনি জহুরুল হক হলের ক্যাফেটেরিয়ার সামনে বসে ৭ জুনের কর্মসূচির পর্যালোচনা করলেন। ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’র নীল একটি পতাকা ছিল, হালকা আকাশি রঙের সাদামাটা পতাকা। আলোচনা হলো এমন একটি পতাকা বানানো যায় কি না যা স্বাধীনতার ইঙ্গিত বহন করে। সিদ্ধান্ত হলো আলোচনা এখানে না করে জহুরুল হক হলের ১১৮নং কক্ষে আ স ম রব, শাজাহান সিরাজের রুমে গিয়ে আলোচনা করার। রুমের দরজা বন্ধ করে আলোচনা শুরু হলো। পতাকার মধ্যে একটি লাল সূর্য থাকতে হবে প্রস্তাব করলেন শাজাহান সিরাজ। আ স ম রব প্রস্তাব করলেন জমিনটা থাকতে হবে সবুজ। শাজাহান সিরাজ প্রতিবাদ করে বললেন সবুজ জমিন দেওয়া যাবে না, কারণ পাকিস্তানের পতাকা সবুজ। এই

সময় মার্শাল মনি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন বাংলাদেশটা সবুজ, ঠিক আছে সবুজ না দিয়ে গাঢ় সবুজ দেওয়া যায় (Bottle Green) সিদ্ধান্ত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। হঠাৎ কাজী আরেফ প্রস্তাব দিলেন লাল সবুজের মধ্যে সোনালি রঙের বাংলাদেশের একটি মানচিত্র দিতে হবে। শাজাহান সিরাজ বললেন আরেফ ভাই আপনি পাগল নাকি? পতাকায় কোনো দেশ মানচিত্র দেয়? কাজী আরেফ বললেন মানচিত্র দেওয়ার কারণ আছে। আমরা যখন কোনো আন্দোলন করি, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী আমাদের আন্দোলনকে ভারতের মদদে আন্দোলন হচ্ছে বলে প্রচার চালায়। মানচিত্র না দিলে যুক্ত বাংলার স্বাধীনতার অপপ্রচার করবে। তাছাড়া আমরাতো পূর্ব পাকিস্তান অংশে অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাই। অতএব মানচিত্রের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করতে হবে। কাজী আরেফ এর এই ব্যাখ্যা শুনে চারজনে রাজি হয়ে গেল। রাত তখন আনুমানিক ২টা। কোথায় পাওয়া যাবে কাপড়-কালি-তুলি। রুমের বাইরে খসরু, স্বপন চৌধুরী (সাংগঠনিক সম্পাদক, ছাত্রলীগ) সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এত রাতে নেতারা কী সিদ্ধান্ত নেয় তা জানার জন্য। খসরুকে ডেকে বলা হলো যে করে হোক রাতেই আনতে হবে পতাকার কাপড়, কালি, তুলি ইত্যাদি। খসরু দুজনকে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিয়ে এল সব। পতাকা সেলাই করে আনল বলাকা হলের দোতলায় ছাত্রলীগের অফিসের পাশের রুমের এক বিহারি দরজির দোকান থেকে। এখন কে আঁকবে লাল সূর্যের মাঝখানে মানচিত্র। কে তুলি দিয়ে লাগাবে সোনালি রং। স্বপন চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হলো রাতেই যোগাড় করতে হবে একজন আর্টিস্ট। স্বপন চৌধুরী বলল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্রলীগ সম্পাদক শিবনারায়ণ দাশকে দেখেছে হলের ক্যাফেটেরিয়ার সামনে। সে ঢাকায় এসেছে, সম্ভবত এস এম হলে বন্ধুর রুমে থাকতে পারে। এস এম হলের রুম খুঁজে তাকে আনা হলো। জহুরুল হক হলের ১২৮নং রুমে ছাত্রলীগের ভূগোল বিভাগের কর্মী থাকত, মানচিত্রের বই আনা হলো। ১১৮নং রুমের মেঝে একটি গামছা চিপে মুছা হলো। পতাকাটা মেঝেতে বিছিয়ে মানচিত্র আঁকা শুরু করল শিবনারায়ণ দাশ। সোনালি দিয়ে ভরাট করা হলো মানচিত্র। দরজা খুলে দেখা গেল পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য টগবগ করছে। সবাই সবার দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেল। পতাকাটি মেঝে থেকে উঠিয়ে মশারি টানার

দড়িতে শুকাতে দেয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো এটি অন্য কেউ জানবে না। একটি খাটো বাঁশে পতাকাটি বেঁধে মুড়িয়ে একজনের হাতে দেওয়া হবে। মার্চপাস্ট করে বঙ্গবন্ধু সামনে যাওয়ামাত্র রব ভাইয়ের হাতে দিবেন।

৭ জুন সকাল ১০টায় সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের চত্বরে জমা হতে থাকে বিশেষ পোশাক ব্যাজ পরিহিত 'জয়বাংলা বাহিনী'র হাজার হাজার ছাত্রলীগের সদস্যরা। নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ-এর নেতৃত্বে লাইন করে ধীরগতিতে শুরু হয় 'জয়বাংলা বাহিনী'র মার্চপাস্ট। যুদ্ধের দামামার মতো ছাত্রলীগের নিজস্ব বাদ্যদল চলতে থাকে বাদ্যের তালে তালে। হাজার হাজার জনতা 'জয় বাংলা বাহিনী'র সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে পল্টন ময়দানের দিকে। পল্টন ময়দানের দুই পাশে দুটি নিচু মঞ্চ করা হয়। এক মঞ্চে দাঁড়াবেন বঙ্গবন্ধু, অপর মঞ্চে দাঁড়াবেন চার ছাত্রনেতা। আনুমানিক ১১:৩০টায় বঙ্গবন্ধু হাজার হাজার মানুষের করতালির মধ্যে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। চার ছাত্রনেতার নেতৃত্ব শুরু হলো 'জয়বাংলা বাহিনী'র মার্চপাস্ট বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানানোর জন্য। বঙ্গবন্ধুর সামনে যাওয়ামাত্র বাঁশে মোড়ানো স্বাধীন বাংলার পতাকাটি তুলে দিল বাহিনীর একজন সদস্য। রব ভাই মঞ্চের সামনে নীল ডাউন হয়ে পতাকাটি খুলে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন। বঙ্গবন্ধু পতাকাটি হাতে তুলে নিয়ে জিহ্বায় কামড় দিল এবং তাৎক্ষণিক হেসে দিয়ে পতাকাটি রব ভাই-এর হাতে দেন। অতঃপর 'জয়বাংলা বাহিনী'র সালাম গ্রহণ করার পর ৭ জুনের কর্মসূচির ইতি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে পতাকাটি সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৮নং কক্ষেই মুড়িয়ে রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে বিশাল ছাত্রজনসভায় আগত ছাত্রলীগের পতাকাবাহী মিছিলটি মঞ্চের সম্মুখে আসতেই আ স ম রব পতাকাটি হাতে নিয়ে তুলে ধরেন অবিস্মরণীয় এই সভায় ছাত্রজনতার সম্মুখে। এটি সেই পতাকা যে পতাকা ১১৬নং কক্ষে সংরক্ষণ ছিল।

শাজাহান সিরাজ

(নিউক্লিয়াস-এর সদস্য, পতাকার অন্যতম রূপকার, তৎকালীন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক)

‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’র পতাকাই হয়ে উঠল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

ইউসূফ সালাহউদ্দীন আহমদ

তখনকার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় ছয় দফা আন্দোলন থেকে। মূলত ১৯৬৮ সাল থেকে। তরুণ সমাজের মাঝে তখনকার ছাত্রলীগ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। ছাত্রলীগের মধ্যে চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয় আমরা যে স্বায়ত্তশাসন চাইছি, তা পাওয়া যাবে না। তাই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিণত করতে হবে। এই চিন্তা ছিল এক অংশের মধ্যে। অপর অংশের চিন্তা ছিল পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা চায় যে অংশটা, তারা মূলত সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে এই ভাবনা শুরু করে। সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক তাঁদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের এই অংশের স্বাধীনতা লাভের ভাবনা বিকশিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

’৬০ দশকের ছয় দফা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগুনঝরা দিনগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিতে একাধিক গোপন ও কিছু কিছু প্রকাশ্য সংগঠন গড়ে ওঠে। ঢাকায় ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছয় দফাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ‘৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় শাণিত ছাত্রলীগের একাংশের উদ্যোগে এমনই একটি সংগঠনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মনে করল এই ষড়যন্ত্র মামলা রাখা যাবে না, এটিকে বাতিল করে দিতে হবে। আসামিদের ঢাকা

সেনানিবাসের ১৪ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারে বন্দি রাখা হয়। এর মধ্যে তারা ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করল। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুসহ সকলে মুক্তি পেলেন। তখন ঠিক করা হলো সার্জেন্ট জহুরুল হককে যে তারিখে হত্যা করা হয়েছে, সেই তারিখের নাম দিয়ে ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’ নামে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটি সংগঠন তৈরি করা হবে। সার্জেন্ট জহুরুল হককে প্রথম শহীদ হিসেবে চিহ্নিত করে এই নাম দেওয়া হয়। এটি সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাকের গ্রুপের সিদ্ধান্ত। এতে শেখ শহিদুল ইসলাম জড়িত ছিলেন অন্য গ্রুপের হওয়া সত্ত্বেও। আমরা ভাবলাম ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’ করতে হলে একটি পতাকা প্রয়োজন, যেটিকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘রেজিমেন্টাল কালার’। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পতাকা বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে নিতে হবে। ১৯৭০ সালের ৭ জুন ছয় দফা দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে শ্রমিক লীগ আয়োজিত সমাবেশের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকে বাহিনীর পক্ষ থেকে অভিবাদন প্রদান ও তার হাত থেকে পতাকা গ্রহণের মাধ্যমে ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’ সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। পতাকার ধারণা আসে এভাবেই। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে এটি তৈরি হয়নি, হয়েছিল বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাহিনী নিউক্লিয়াসের মূল চেতনা থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুদিবসকে স্মরণ করে– তাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে।

ইতিহাসের একটা দুঃখজনক ব্যাপার আছে এখানে। ‘ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী’ ছিল এই বাহিনীর নাম। পরবর্তীকালে ‘জয়বাংলা বাহিনী’ নামে এই বাহিনী ব্যাপক প্রচার পায় এবং সবাই এই নামেই ডাকতে শুরু করায় সেই নামটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখনও ‘জয়বাংলা’ স্লোগান আসেইনি। এ বিষয়ে শাজাহান সিরাজের ধারণকৃত বক্তব্য আছে।

তৎকালীন ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রব এবং শাজাহান সিরাজের নামে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৮নং কক্ষটি বরাদ্দ ছিল। ৬ জুন পতাকা তৈরি নিয়ে মিটিং হয় এখানেই। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমদ, মনিরুল ইসলাম

ওরফে মার্শাল মনি, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু, চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান এবং আমি। সভায় কাজী আরেফ আহমেদের প্রস্তাবের উপর আলাপ-আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো পতাকায় সবুজ জমিনের ওপর থাকবে একটি লাল বৃত্ত, আর লাল বৃত্তের মাঝে থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। সবুজ জমিন বাংলার চির সবুজের প্রতীক, শহিদের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠবে স্বাধীনতার সূর্য। সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত তারই প্রতীক আর জন্ম নেবে একটি নতুন দেশ, সোনালি আঁশের রঙে হবে যার পরিচয়। লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনালি রঙের মানচিত্র হবে তারই প্রতীক। তখন পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা নিয়ে নানা বিতর্ক চলছিল। অনেকে বলেছেন এটি অবিভক্ত বাংলা তৈরির আন্দোলন। দুটো ষড়যন্ত্র ছিল, একটা ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো, আরেকটা ভারত থেকে পশ্চিম বাংলা আলাদা করে দেখানো। তাই সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক বিশেষভাবে খেয়াল রাখছিলেন। কাজী আরেফ আহমেদ বলেছিলেন যেহেতু এটি নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, অবিভক্ত বাংলা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে; তাই উভয়মুখি চক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকতে বাংলাদেশের মানচিত্রটা অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন। যেটি সব কনফিউশন দূর করবে যে আমরা পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কোনো যুক্ত বাংলা চাইছি না। কিন্তু মানচিত্রটা কী রঙের হবে তা নিয়ে চিন্তা চলছিল। আমি চুপচাপ বসে সব শুনছিলাম। তখন আরেফ আহমেদ বা কেউ একজন বলেন যেহেতু আমাদের সোনালি আঁশের দেশ, সোনালি রং করা হোক, যেটি বাংলাদেশের সোনালি আঁশের পরিচায়ক হবে। কারও কোনো দ্বিমত হলো না। তাছাড়া তাড়াহুড়ো ছিল।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবাই কাজে নেমে পড়লাম। মিটিংয়ে অবস্থান না করেও যাঁরা পতাকা তৈরির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শেখ সহিদুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস, গোলাম ফারুক, রফিকুল ইসলাম ওরফে লিটিল কমরেড ও কামরুল আলম খান ওরফে খসরু অন্যতম।

খসরু ভাই কয়েকজন ছাত্রকর্মীকে নিয়ে গেলেন বলাকা সিনেমা হলের তিনতলায় এক বিহারি দরজির দোকানে। বড় এক টুকরো সবুজ

কাপড়ের মাঝে সেলাই করে আনলেন লাল বৃত্ত। সমস্যা হলো পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র নিয়ে। লাল বৃত্তের মাঝে সোনালি রং দিয়ে আঁকা হবে। কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাশ ছিলেন এস এম হলে। আঁকাআঁকিতে শিবুদার হাত ছিল ভালো। তিনি বললেন, 'আমি বাপু পেইন্ট করতে পারব, তবে মানচিত্র আঁকতে পারব না।' ঠিক করলাম হাসানুল হক ইনু আর আমি পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র ট্রেসিং পেপারে ট্রেস করে নিয়ে আসব। আমরা গেলাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন জিন্নাহ্ হলে (বর্তমান তিতুমীর হল)। উল্লেখ্য আমি এবং ইনু ভাই তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। জিন্নাহ্ হলের ৩১২নং কক্ষে থাকতেন এনামুল হক, ইনু ভাইয়ের কাজিন, ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি ছিলেন। তার কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকলাম পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। রফিকুল ইসলাম, যিনি বর্তমানে আমেরিকা থাকেন, তার এক বন্ধু রঙের দোকান ছিল। রাত্রিবেলায় দোকান খুলে রং নিয়ে এলেন।

আমরা ফিরলাম ইকবাল হলের ১১৬নং কক্ষে। বাকি সবাই সেখানে অপেক্ষা করছিল। শিবুদা তার নিপুণ হাতে ট্রেসিং পেপার কেটে লাল বৃত্তের উপর বসিয়ে তাতে সোনালি রং লাগিয়ে দিলেন। হয়ে গেল বাংলাদেশের মানচিত্র। তৈরি হয়ে গেল বাহিনী পতাকা। পতাকা তৈরির সঙ্গে জড়িত যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি, তারা ছাড়াও আরো অনেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মী এই বাহিনী সংগঠিত করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের মাঝে আ ফ ম মাহবুবুল হক, আফতাবউদ্দীন আহমদ, রেজাউল হক চৌধুরী, স্বপন কুমার চৌধুরী, বদিউল আলম, রায়হান ফেরদৌস, বিপ্লব রায়, আবদুল্লাহ সানি, মইনুল ইসলাম চৌধুরী, আব্দুল হক, নজরুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ অন্যতম। এখানে বলা প্রয়োজন যে উল্লিখিত নামের বাইরেও আরো অনেকেই এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যাঁদের অনেকের নাম আজ ৫৩ বছর পর আমার স্মরণে নেই।

পরদিন ৭ জুন সকালে আমরা বাহিনীর সদস্যরা সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাঙ্গণে জমায়েত হলাম। সেখান থেকে মিছিল করে পল্টন ময়দানে গেলাম। মঞ্চে অপেক্ষমাণ বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জ্ঞাপন শেষে আ স ম রব বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে উপরোল্লিখিত বাহিনী পতাকা গ্রহণ করেন। এই

পতাকা নিয়েই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আর পরবর্তীতে এই পতাকাই মানচিত্র বাদ দিয়ে জাতীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হয়।

যদি বলা হয় শিবনারায়ণ দাশ জাতীয় পতাকার রূপকার, পতাকার শিল্পী, তাহলে তা হবে ইতিহাস বিকৃতি, অপব্যাখ্যা। বেঁচে থাকতে তা মেনে নিতে পারি না। হাসানুল হক ইনু, আবদুর রব, শেখ শহিদুল ইসলাম, আমি আছি। শেখ শহিদুল ইসলাম পতাকা তৈরির পরদিন কুচকাওয়াজের জন্য মিছিল সংগঠিত করেছিলেন। শিবুদা কখনো খোলাসা করেননি তার কাজ, অংশগ্রহণ। তার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু রূপকার তিনি নন।

ইতিহাস কাছ থেকে দেখা যায় না, দূর থেকে দেখলেই প্রকৃত ইতিহাস দেখা যায়। ইতিহাস সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত সবাই গত হলেও পরবর্তী প্রজন্ম তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে মূল সত্য খুঁজে বের করতে পারবে। যেহেতু তাদের সঙ্গে স্বার্থ জড়িত থাকবে না, তারাই পারবে সঠিক ইতিহাস লিখতে। আমরা যারা ছিলাম, তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ থাকলেই কেবল সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

ইউসুফ সালাহউদ্দীন আহমদ

(তৎসময়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।)

তোমার পতাকা যারে দাও

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

[মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) লেখক শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৯।]

১৯৭০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হকের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী আমাদের পক্ষ থেকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় পালন করা হয়। জহুর বাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা সাদা ড্রেস পরে (মেয়েরা লাল পাড়ের সাদা শাড়ি এবং ছেলেরা সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট ও পিটি জুতা) কাঠের ড্যামি রাইফেল দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় কুচকাওয়াজের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণ করি।

১৯৭০-এর ৭ জুন, ৬-দফা দিবসের দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পল্টন ময়দানে শ্রমিক-জনতার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানোর ঘোষণা দেওয়া হলে আমরাও ওইদিনই জহুর বাহিনীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিই। এ উপলক্ষে কর্মসূচি চূড়ান্ত করার জন্য ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থিদের নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে ৬ জুন সন্ধ্যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হলের ছাত্র-সংসদ কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাব করা হয় বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে জহুর বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি স্বতন্ত্র 'সিম্বলিক পতাকা' প্রদান করার। সকলের কাছে প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে জহুর বাহিনীর পতাকা কী হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব আসতে থাকে। প্রথমেই শাজাহান সিরাজ প্রস্তাব রাখেন পতাকায় উদীয়মান লাল সূর্য রাখার জন্য, এটিকে মেনে নিয়ে প্রস্তাব আসতে থাকে পতাকার জমিন নিয়ে। সাদা জমিন বাদ দেওয়া হয় জাপানের পতাকার অনুরূপ বলে, এরপর সবুজ রংটি বাংলাদেশকে বোঝানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হলেও পাকিস্তানের পতাকার

জমিনের রং হিসেবে এটিকে বাদ দেওয়া হয়। এ সময়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আর্টিস্ট শিবনারায়ণ দাশ (ছাত্রলীগের এই একনিষ্ঠ সার্বক্ষণিক কর্মীকে আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের পোস্টার লেখার জন্য সে সময়ে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল) প্রস্তাব করেন পতাকার জমিন গাঢ় সবুজ রঙের করার জন্য। এই রঙের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি রক্ত এবং ত্যাগের বিনিময়েই একমাত্র স্বাধীনতা আসতে পারে সেহেতু গাঢ় সবুজ রং-ই সবচেয়ে উপযুক্ত রং, কেননা সবুজের সঙ্গে লাল মিশেই গাঢ় সবুজ হয়।' তার এই ব্যাখ্যার পর সকলেই পতাকার জমিন হিসেবে গাঢ় সবুজ রংটিকেই এক বাক্যে মেনে নেন। এরপর প্রস্তাব আসে যেহেতু আমরা (জহুর বাহিনীর সদস্যরা) বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, সেহেতু এই বাহিনী এবং পতাকা নিয়ে যেন কোনো বিভ্রান্তি না থাকে সেজন্য 'সোনার বাংলা'র প্রতীক বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্র উদীয়মান সূর্যের মধ্যে এঁকে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবটিও উপযুক্ত বিবেচনা করে সকলেই এক বাক্যে গ্রহণ করেন।

এদিকে আলাপ-আলোচনায় অনেক রাত হয়ে গেলে সকলের খেয়াল হলো এত রাতে পতাকা তৈরির কাপড় এবং জিনিসপত্র কীভাবে যোগাড় হবে। সভায় উপস্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব সে রাতে কাপড় এবং রং যোগাড় করার দায়িত্ব নেন। কামরুল আমান খসরুকে পাঠিয়ে নিউ মার্কেট এলাকা থেকে দোকান খুলিয়ে গাঢ় সবুজ ও লাল রঙের কাপড় এবং সোনালি রঙের কৌটা যোগাড় করে আনা হয়। এরপর জগন্নাথ কলেজের নজরুল ইসলাম (স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ) এবং ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক একরামুল হক এই দুইজন গিয়ে বলাকা ভবন (৩য়তলা) ছাত্রলীগ অফিসের পাশের রুমে অবস্থিত 'পাক ফ্যাশন' নামের দর্জির দোকানের কর্মচারীদেরকে ঘুম থেকে তুলে পতাকাটি সেলাই করিয়ে নিয়ে আসেন। সবশেষে গভীর রাতে পতাকা তৈরির উপকরণাদি যখন শিবনারায়ণ দাশের হাতে এসে পৌঁছে লাল সূর্যের মধ্যে সোনালি মানচিত্র আঁকার জন্য, তখন দেখা গেল মানচিত্র আঁকার মতো প্রয়োজনীয় চিকন তুলি তার কাছে নেই, তার কাছে সবই পোস্টার লেখার মোটা তুলি। এ সময়ে নিজের সৃজনশীল বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ইকবাল হলের **১১৬**নং কক্ষে সারারাত জেগে প্রচণ্ড উৎসাহ এবং

একাগ্রতা সহকারে রংয়ের কৌটায় দেয়াশলাইয়ের কাঠি ডুবিয়ে শিবনারায়ণ দাশ পতাকায় বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্রটি আঁকেন। ৭ জুন সকালে শিবনারায়ণ দাশ তার কাজ শেষ করে পতাকাটি ইকবাল হলের **১১৬**নং কক্ষের জানালায় শুকাতে দেন, সে সময়ে ভোরের আকাশে নতুন সূর্য উঁকি দিচ্ছে, কক্ষের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সোনালি রং মাখানো অসংখ্য দেয়াশলাইয়ের কাঠি এবং মেঝেতে জ্বলজ্বল করছে পতাকার কাপড় ভেদ করে আসা সোনালি মানচিত্রের ছাপ।

১৯৭০-এর ৭ জুন সকালে আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে সমবেত হয়ে সেখান থেকে ব্যান্ডের (জগন্নাথ কলেজ থেকে নজরুল ইসলাম নিজ উদ্যোগে ব্যান্ডের দল যোগাড় করে আনেন) তালে তালে পা ফেলে বাছা বাছা কর্মীদের নিয়ে গঠিত জহুর বাহিনী নতুন পতাকাটি সহকারে হাজির হয় পল্টন ময়দানে। সেখানে তখন বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়ার কাজ চলছিল। আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আ স ম আবদুর রব বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পতাকাটি উপহার দেন, বঙ্গবন্ধুও অভিবাদন সহকারে পতাকাটি গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ছাত্রলীগের মত ও ধারা সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন, তাই পতাকাটি হাতে নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝে ফেলেন এবং আ স ম রবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে পাশে দাঁড়ানো শেখ কামালের হাতে পতাকাটি দিয়ে দেন। সেদিনই পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠান শেষে 'পতাকাটি বাসায় রাখা ঠিক হবে না, এটি বরং আপনার কাছে থাক' বলে শেখ কামাল পতাকাটি আমাকে দিয়ে দেয়। আমি পতাকাটি বাসায় নিয়ে আসি এবং আমার ঘরে বইয়ের তাকে এটিকে ভাঁজ করে রেখে দিই। এরপর নতুন নতুন ঘটনা আর কর্মসূচির মধ্যে পতাকাটির কথা সবাই একরকম ভুলেই যাই। '**৭১**-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ ও আঞ্চলিক শাখা থেকে **২১** ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে যে সমস্ত সংকলন বের হয় তার সৌজন্য কপি এসে জমা হয় আমার বইয়ের তাকে এবং সেগুলোর নিচে পতাকাটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

১৯৭১-এর **১** মার্চ দুপুরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই

ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জগন্নাথ কলেজসহ ঢাকা শহর ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ২ মার্চ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে হরতালসহ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জমায়েত ও বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভার একক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

২ মার্চ সকালে পাড়ার ছেলেরা এক এক করে আমার বাসায় আসে একসঙ্গে মিছিল করে বটতলায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ওদেরকে রুমে বসিয়ে রেখে আমি ভেতরে যাই সেদিনকার মতো বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। পাড়ার ছেলেরা রুমে বসে বইয়ের তাক থেকে ২১ ফেব্রুয়ারির সংকলনগুলো দেখতে থাকলে সংকলনের নিচ থেকে পতাকাটি বেরিয়ে পড়ে। এরা কেউই জহুর বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না এবং সে কারণেই পতাকার বিষয়ে কিছুই জানত না। কিন্তু পতাকার মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র থাকায় সে সময়ে এর মানে বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হয়নি। আগ্রহ, উত্তেজনা এবং উৎসাহের সঙ্গে পতাকাটি উপস্থিত সকলের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। এ সময়ে গুলবাগ আমার বাসার পাশে রেল লাইন দিয়ে একটি ট্রেন কমলাপুর থেকে ছেড়ে সম্ভবত ময়মনসিংহ যাচ্ছিল, ছেলেরা রেল লাইনের পাশের লাউয়ের মাচা থেকে একটি বাঁশ খুলে নিয়ে পতাকাটি বাঁধে। যেহেতু সেদিন ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে হরতাল ডাকা হয়েছে, তাই ওরা পতাকাটি হাতে নিয়ে রেল লাইন অবরোধ করে দাঁড়ায়। ট্রেন থামার পর যাত্রীরাও নতুন ধরনের পতাকা দেখে ভিড় করে নেমে আসে। এর মধ্যে আমি রেডি হয়ে যখন বাসার বাইরে আসি, তখন বাসার সামনে পতাকাটি ঘিরে ছাত্র-জনতার বেশ বড়সড় ভিড় জমে গেছে। আমি এসে এদের সঙ্গে যোগ দিতে পতাকাটি আমার হাতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং আমরা মিছিল করে বটতলার দিকে রওয়ানা হই। মিছিলটি নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী হয়ে রমনা 'প্রেসিডেন্ট হাউস' (বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধা) এর মিলিটারি প্রহরীদের উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে আমরা রমনা পার্ক এবং রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) মাঝখান দিয়ে কোণাকুণি হেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন বটতলার সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছানোর আগেই বটতলায় সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছাত্র সমাজের প্রস্তুতি থাকায় সেদিন বটতলায় কোনো মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ধারণার বাইরে ছাত্র-জনতা উপস্থিত হওয়ায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস খান মাখন ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী, সহ-সম্পাদক একরামুল হক, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জিনাত আলী ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস, ঢাকা শহর শাখার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক চৌধুরী মোশতাক প্রমুখ নেতারা বাধ্য হয়ে, বটতলার পাশে কলাভবনের পশ্চিম দিকের প্রবেশ মুখের সিঁড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। আমরা পতাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকার অব্যবহিত পরেই চারদিকে বিপুল সাড়া পড়ে যায়, সামনে বসে যারা বক্তব্য শুনছিলেন তারা সকলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানায়। এ সময়ে স্লোগানে স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। সামনের দিক থেকে সবাই সরে আমাদেরকে সিঁড়ির ছাদের কাছে যাওয়ার পথ করে দেয়, সভার মাঝখান দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির ছাদের নিচে গিয়ে পতাকাটি উপরে ছাদে দাঁড়ানো আ স ম আব্দুর রবের হাতে তুলে দিই। আ স ম আবদুর রব পতাকাটি হাতে নিয়ে উপরে তুলে ধরে দোলাতে থাকলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মুহুর্মুহু স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এরপর আর কারও পক্ষে বক্তব্য দেওয়া বা সভার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। বিকালে পল্টন ময়দানে জনসভায় আসার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্লোগান দিতে দিতে বটতলা থেকে অসংখ্য মিছিল যার যার গন্তব্যের দিকে বেরিয়ে যায় বিকালের সভায় আসার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য।

২ মার্চ বিকালে পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেদিন সকালে যারা বটতলার ছাত্রসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, তারা যে যেভাবে পতাকাটি দেখেছেন সেভাবেই ছোট, বড়, মাঝারি আকারের হাজার হাজার পতাকা বানিয়ে নিয়ে আসেন। একদিন যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা এই পতাকার রূপ দিয়েছিলাম, একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটি এমনিভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে যায়, পরিণত হয় জনতার সম্পদে।

১৯৭১-এর ২ মার্চ এই ঘটনার পরদিন ৩ মার্চ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। পরবর্তীতে ছাত্রলীগের বর্ধিত কমিটির সভায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী (স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রামের বিএলএফ আঞ্চলিক কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় শহীদ হন) 'স্বাধীনতার প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। এই বর্ধিত সভায় একটানা ৫ দিনব্যাপী আলাপ আলোচনার পর স্বপন কুমার চৌধুরীর প্রস্তাব অনুযায়ী পতাকা ও জাতীয় সংগীত সংবলিত 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস'-এর দিন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এবং 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং কামরুল আমান খসরু একটি পয়েন্ট ২২ রাইফেল দিয়ে শূন্যে ফায়ার করে গান সেলুট প্রদান করেন। এ সময়ে মাইকে আমাদের জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলা গানটিও বাজানো হয়।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কামরুল হাসানকে দিয়ে মাঝখানের সূর্যসহ সম্পূর্ণ পতাকার আনুপাতিক মাপ নিয়ে ডিজাইন করে নেওয়া হয় এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীন দেশের যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিক পতাকা হিসেবে মাঝখানে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্রটি তুলে দেওয়া হয়।

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
(তৎকালীন ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।)

শিবনারায়ণ দাশের সাক্ষাৎকার

দৈনিক সমকালে প্রকাশিত হয়েছে ২৬ এপ্রিল ২০২৪
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মার্জিয়া লিপি
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৩ নভেম্বর, ২০১৬

[শিবনারায়ণ দাশের মৃত্যুর পর ২৬ এপ্রিল ২০২৪ এই সাক্ষাৎকার দৈনিক সমকালে ছাপা হয়। পুরো সাক্ষাৎকারটি শুধু প্রশ্ন ও উত্তরের ভিত্তিতে নয়। এই সাক্ষাৎকারের বড় অংশ জুড়ে শিবনারায়ণ দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর আলোচনা ও বাকি অংশ প্রশ্ন ও উত্তরভিত্তিক। সমকালে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার অবিকলভাবে ছাপানো হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে পাদটীকা যুক্ত করেছে।]

'কামিনী-কাঞ্চন বিপ্লব পরিপন্থি'।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও 'ওয়ান্টেড' ছিলাম, স্বাধীনতার পরেও ছিলাম 'ওয়ান্টেড'। '৬৩ সালে স্বাধীন হওয়ার আগে জেলে ছিলাম, '৭২ সালে স্বাধীন দেশেও জেলে যেতে হয়। বলছিলেন ২ নম্বর সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অন্যতম রূপকার শিবনারায়ণ দাশ। তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কুমিল্লা শহরে মাইকিং করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তারই এক সহপাঠী সেদিন মাইকিং করে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি নিজেই মাইকে ঘোষণা শুনছিলেন– 'শিবনারায়ণ দাশকে ধরিয়ে দিলে ৩০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।' চশমা ছাড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছিলেন। ছদ্মবেশের কারণে অন্যরা চিনতে পারেনি।

শৈশবেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব তার রাজনৈতিক চেতনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিপ্লবের জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন তিনি।

সবসময় রাজনৈতিক গুরুদের উপদেশ স্মরণ করতেন ‘কামিনী-কাঞ্চন বিপ্লব পরিপন্থি’। ১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সব রকমের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, মিছিল, অবরোধ ও আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন শিবনারায়ণ দাশ। তার কথায় ‘বড় হয়ে বুঝেছি একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পৃক্ত।’

শিবনারায়ণ দাশের জেলজীবন শুরু হয় ১৯৬৩ সালে। সে সময়ে তার বিরুদ্ধে হুলিয়া ছিল। কখনো বাড়িতে এলে মা যোগমায়া দাস সে রাতে ঘুমাতেন না। পাহারা দিতেন। গোয়েন্দারাও পাহারা দিতেন পালাক্রমে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে তাকে আবারও স্বাধীন দেশে জেলে যেতে হয়।

১৯৭১ সালে গোপন সংগঠনের সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তাদের মাধ্যমে শিবনারায়ণ দাশ জানতে পারেন ২৫ মার্চের রাতে ক্র্যাকডাউনের কথা। বেলুচ সেনাসদস্যদের দুজন সে সময়ে মা যোগমায়া দাসকে বলেন, তোমরা বাসা ছেড়ে দাও। সাত ছেলেমেয়েসহ কোথায় আশ্রয় নেবেন মা? ছেলে শিবনারায়ণ দাশের বিরুদ্ধে হুলিয়া ছাড়াও শহরে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাইকিং করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে বলে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজন যারা ছিলেন, তাদের কেউ আশ্রয় দেওয়ার সাহস করতেন না। এমন রাতও তার জীবনে গেছে, বাড়ির মালিকের অগোচরে গোয়ালঘরে রাতে থেকেছেন। মার্চের এক সকালে মা যোগমায়া দাস গোলপুকুর পাড়ের এক বাসায় শিবনারায়ণকে বলেন, ‘তুমি আর এ শহরে থেকো না, পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। তোমার বাবাকে নিয়ে চিন্তা করছি না, যতটা দুশ্চিন্তা করছি তোমাকে নিয়ে। তুমি যাও। আমি কিছুটা গুছিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ত্রিপুরায় চলে আসব।’

মুক্তিযুদ্ধে যখন অংশগ্রহণ করেন, তখন তার বয়স ছিল চব্বিশ বছরের কিছু বেশি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শিবনারায়ণ দাশ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও কর্মীদের নিয়ে নিজের শহর কুমিল্লা থেকে ভারতের সীমান্ত সোনামুড়ায় চলে যান। সংগ্রহে থাকা অস্ত্র মাটিচাপা দিয়ে রাখেন। সোনামুড়ায় পৌঁছানোর পর এক কর্মীর মাধ্যমে বাড়িতে মাকে খবর জানান সীমান্ত অতিক্রমের। মা যোগমায়া মাসখানেকের মধ্যেই ভারতের

সীমান্তে সোনামুড়ায় পৌঁছান। ক্যাম্পের রান্নাবান্নার দায়িত্ব পালন করেন হাসিমুখে।

কলকাতায় মামাদের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে মামারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে নিতে আসার খবর জানান। মায়ের আত্মসম্মানবোধ প্রখর ছিল, তাই কলকাতায় গিয়ে মামাদের আশ্রয়ে না থেকে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন।

২৫ মার্চ রাতে কুমিল্লার বাগিচা গাঁওয়ের বাসা থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শিবনারায়ণ দাশকে না পেয়ে বাড়িঘর লুটপাট করে, আগুন দেয়। কাকা ও বাবা সতীশ চন্দ্রকে ধরে নিয়ে যায়। বাবা ছিলেন কেমিস্ট, আয়ুর্বেদ ঔষধ উৎপাদনকারী। তাদের দুটি ঔষধ খুব জনপ্রিয় ছিল, ‘কালোমেঘ’ ও ‘বিসমুজিন’। হানাদার বাহিনী এপ্রিলের শুরুতেই কুমিল্লায় তার বাবা ও কাকাকে হত্যা করে। মিলিটারি জিপের সঙ্গে তাদের মরদেহ রশি দিয়ে বেঁধে কুমিল্লা টাউন ঘোরানো হয়।

‘আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা নকশার’। আমার সৌভাগ্য, ২০১৬-এর নভেম্বরে তিনি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন। অফিস শেষে পৌঁছে যাই মণিপুরের ৫ নম্বর গেটের বাসায়। জানতে চাই মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা। যুদ্ধদিনে তার মায়ের ভূমিকা, অনুপ্রেরণা, আত্মত্যাগের কথা। শুরুতে নিজের সম্পর্কে কিছুই বলছিলেন না। তিনি আমাদের জাতীয় পতাকার গর্বিত অংশীদার। এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না; কোনো কিছু প্রকাশ করতে চাইতেন না। প্রচার-সর্বস্বতার যুগে ছিলেন আশ্চর্যরকম নিশ্চুপ।

আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে মা যোগমায়া দাস সম্পর্কে কিছু বলবেন, সেই কারণে। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিলেন মা যোগমায়া দাস। সেদিন মনের আগল ভেঙে বলেছিলেন শুধু মায়ের কথাই না, বাবা-কাকার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার কথা, নিজের কথা, পরিবারের কথা; আট ভাই-বোন আর মা-বাবা, কাকাদের নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। বলেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা স্ত্রী গীতশ্রী, একমাত্র সন্তান অর্ণব আদিত্যের কথা।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সময় আপনার বয়স কত ছিল?

শিবনারায়ণ দাশ : সে সময়ে আমার বয়স ছিল ২৪ বছর কয়েক মাস। ১৯৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরে আমার জন্ম।

মার্জিয়া লিপি : ১৯৭১-এর পূর্বে কোনো আন্দোলনে আপনার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোনো সমর্থন অথবা সম্পৃক্ততা ছিল; রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা সাংগঠনিক?

শিবনারায়ণ দাশ : স্কুলে পড়াশোনার সময়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতেখড়ি। সে সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ আজ অবধি যত আন্দোলন হয়েছে, এ সবকিছুতেই সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল।

ছাত্র সংগঠন ছাত্রশক্তি (৩) ও ছাত্রলীগের হয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৬৩ থেকে শুরু হয় জেলজীবন। ১৯৭০ সালে কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনেও যুদ্ধ করি। স্বাধীনতার আগেই বুঝতে পারি প্রগতিশীল দল তৈরি করতে হতে পারে। ১৯৭২ সালে যোগ দিই জাসদে।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে প্রধান যৌক্তিকতা কী ছিল?

শিবনারায়ণ দাশ : মানুষের মুক্তির জন্য, দেশের মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করা।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধে যাবার প্রেক্ষাপট কী ছিল?

শিবনারায়ণ দাশ : বৈষম্য, পাকিস্তানিদের দুঃশাসন, অন্যায্যতা, নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়া বিকল্প ছিল না।

মার্জিয়া লিপি : বিশেষ কোন ঘটনার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

শিবনারায়ণ দাশ : ১৯৭১ সালে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলনের পরই নিজ শহর কুমিল্লায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হুলিয়া থাকায় মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ঘর ছাড়ি। সোনামুড়া

সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের ত্রিপুরায় চলে যাই। ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করি। গেরিলা যোদ্ধা হয়ে বিভিন্ন অপারেশনে যাই।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী ছিল? কীভাবে তা অতিক্রম করেন?

শিবনারায়ণ দাশ : কুমিল্লার বাগিচাগাঁওয়ে ছিল আমাদের বাড়ি। ছোট শহরে সবাইকে সবাই চিনত। হুলিয়ার কারণে যেকোনো সময়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ছদ্মবেশে সীমান্ত পাড়ি দিতে হয়।

মার্জিয়া লিপি : কোন সেক্টরে যোগ দিয়েছিলেন?

শিবনারায়ণ দাশ : ২ নম্বর সেক্টরে ক্র্যাক প্লাটুনে।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন?

শিবনারায়ণ দাশ : দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ, সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং হুলিয়া– এসব কিছুর জন্য মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারতের ত্রিপুরায় চলে যাই।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার কোনো রাষ্ট্রীয় পদক বা সনদ আছে?

শিবনারায়ণ দাশ : কোনো কিছুই নেই। আমি তো পদকের জন্য যুদ্ধে যাইনি। পদক বা স্বীকৃতি চাইনি। সে আশায় মুক্তিযুদ্ধ করিনি। কাজেই আমার কোনো স্বীকৃতি বা সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন নেই। একাত্তরে সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চাইনি। বাবা শহীদ বুদ্ধিজীবী চিকিৎসক সতীশচন্দ্র দাস মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়ার পরেও শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি কিংবা শহীদের স্বীকৃতি পাননি।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের কথা কবে জানতে পেরেছিলেন?

শিবনারায়ণ দাশ : ১৯৭১ সালে ১৩ ডিসেম্বরের দিকে মনে হয় আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে যাচ্ছি।

মার্জিয়া লিপি : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম, যা মনে পড়লে আপনি অহংকার বোধ করেন?

শিবনারায়ণ দাশ : যুদ্ধের প্রতিটি দিনই উল্লেখযোগ্য। তবে বাবা-কাকার মৃত্যু, আমার কারণে পরিবারের বিপন্নতায় নিজেকে দায়ী মনে করি। বিজয় দিবসের জন্য অহংকার হয়।

মার্জিয়া লিপি : সরকারের কাছে আপনার কোনো প্রত্যাশা রয়েছে কিনা?

শিবনারায়ণ দাশ : কোনো সরকারের কাছেই আমার কোনোদিন, কোনো প্রত্যাশা ছিল না, এখনও নেই।

মার্জিয়া লিপি : স্বাধীন বাংলার পতাকার ইতিহাস শুনতে চাই।

শিবনারায়ণ দাশ : ১৯৭০ সালের ৭ জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের কথা ছিল। সেজন্য ছাত্ররা পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। এর আগের রাতে (৬ জুন, ১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৬ নম্বর কক্ষে ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম পতাকা নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরী, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু ও ছাত্রনেতা ইউসূফ সালাহউদ্দীন। সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি ছিলাম তখন কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা। সভায় কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা হয়। সবুজ জমিনের ওপর লাল সূর্যের মাঝে হলুদ রঙের বাংলার মানচিত্রখচিত পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কামরুল আলম খান তখন ঢাকা নিউমার্কেটের এক বিহারি দর্জির দোকান থেকে বড় এক টুকরো সবুজ কাপড়ের মাঝে লাল একটি বৃত্ত সেলাই করে আনেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিতুমীর হলের ৩১২ নম্বর কক্ষের এনামুল হকের কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র।

আমি আঁকাআঁকি করতে পারতাম। স্কুলে পড়ার সময়ে বিভিন্ন পোস্টার ডিজাইন করেছি। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা নকশার। মানচিত্রে গাঢ় সবুজ জমিনের ভেতর লাল বৃত্তের সূর্যের মাঝে সোনালি হলুদ রঙের বাংলার মানচিত্র আঁকি। পরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পটুয়া কামরুল হাসান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নতুন রূপ দেন।

'স্বাধীনতার পর সেই আদর্শ ছিনতাই হয়ে গেছে'।

সরকারি নথিপত্র, পাঠ্যপুস্তক বা গণমাধ্যমেও বরাবর উপেক্ষিত থেকে গেছে জাতীয় পতাকার এই নকশাকারের নাম। মেলেনি কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। স্বাধীনতার পর মূল পতাকাটি ঠিক রেখে কেবল লাল সূর্যের ভেতরের মানচিত্রটি বাদ দেওয়া হয়। শিবনারায়ণ দাশের এসব নিয়ে আক্ষেপ ছিল না। গণমাধ্যমে কিছু বলতেও ছিলেন নারাজ। বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতেন বরাবর।

সেদিন সাক্ষাৎকারের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলার পতাকার নকশা নিয়ে স্মৃতিচারণের অনুরোধে তিনি বলেন, 'এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না। কারণ বলতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। সব অপ্রিয় সত্য বলার সময় এখনও আসেনি। সময় হলে সব একসঙ্গেই বলব।' বলেন, 'যে আদর্শ নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, স্বাধীনতার পর সেই আদর্শ ছিনতাই হয়ে গেছে। আমরা একটি প্রকৃত বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলাম, যেখানে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য আর ঘুষ-দুর্নীতি থাকবে না। আমরা চেয়েছিলাম একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে। কিন্তু তা হয়নি।

বিগত ৪০ বছর ধরে আমাদের শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের নামে যে আদর্শ প্রচার করছে, তা তাদের দলীয় আদর্শ। অথচ মুক্তিযুদ্ধ কোনো দল বা গোষ্ঠীর যুদ্ধ ছিল না। সেনাকর্মকর্তাদের যুদ্ধও নয়।

এটি ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, লুঙ্গি পরা লোকের মুক্তির লড়াই। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আদর্শটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমরা যারা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, এটি আমাদেরই ব্যর্থতা।'

জাতীয় পতাকার অন্যতম রূপকার শিবনারায়ণ দাস ১৯ এপ্রিল সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে অনন্ত যাত্রা করেন। মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তার আমৃত্যু।

(প্রথম খসড়া নমুনা পতাকার আঁকিয়ে, তৎকালীন কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক)

শিবনারায়ণ দাশ বিএলএফ-এর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি কুমিল্লা অঞ্চলের কমান্ডার হয়ে কুমিল্লায় প্রবেশ করেন। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে দেবগ্রামে রেবতী বর্মনের পোড়াবাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করেন। এলাকায় রাজাকারের দল বৃদ্ধি পেলে বাধ্য হয়ে তারা নবীনগর শ্যামগ্রাম গ্রামে ক্যাম্প সরিয়ে নেন। এখানে থাকাকালীন কিছুদিনের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তারা ঢাকায় ফিরে আসেন। তার প্রাক্তন কমান্ডার ছিলেন নাজমুল হাসান পাখি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাজমুল হাসান পাখিই তাকে নিবন্ধিত করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার অনুযায়ী তিনি ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করার তথ্য দিয়েছেন, যা সঠিক নয়।

বাংলাদেশের পতাকার ইতিহাস

রায়হান ফেরদৌস মধু

বছর খানেক ধরে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছি আমাদের অনেকের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ লিনু হক মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলি এবং তার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের অংশগ্রহণ এবং অবদানকে সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটন করার তাগিদ অনুভব করছেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার সত্যতা এবং তার প্রকৃত নায়কদের উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি কলম ধরেছেন এবং ইতিমধ্যে তার কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেছেন, আপনারা কেউ যখন লিখছেন না, তখন আমিই লিখব যতদূর জানি এবং পারি।

উনসত্তরের শীতকালের কথা, ডিসেম্বর মাসের একেবারে শেষ। জয় বাংলা স্লোগানের উদগাতা প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আফতাব এবং আমি সূর্য সেন হলের কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ের মল এলাকায় বসে আছি। জয় বাংলা স্লোগানের সফল অভিষেকের পর আমাদের সবার মধ্যে একটা যুদ্ধ জয়ের ভাব। কথায় কথায় আফতাব বলল, আচ্ছা জয় বাংলা স্লোগান তো হলো, কিন্তু জাতীয় পতাকার কী হবে? শুরু হলো আমাদের দুজনের আলোচনা। প্রথমেই ঠিক হলো, ডিজাইনটা যা-ই হোক না কেন, সবুজ এবং লাল এই দুই রং থাকতেই হবে। শুরু হলো বিভিন্ন ডিজাইন নিয়ে আলোচনা, রীতিমতো এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। অনেক আলাপ-আলোচনার পর আমরা এখন আমাদের জাতীয় পতাকার যে ডিজাইন, তাতে একমত হলাম। স্পষ্ট মনে আছে আমি শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম তাহলে আমাদের পতাকাটা হবে অনেকটা জাপানের পতাকার মতো, শুধু সাদার জায়গায় সবুজ (বটল গ্রিন)। দেড় কেজি ওজনের একটা থাবা পিঠের উপর মেরে আফতাব বলল, এক্সাক্টলি তাই। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত।

তারপর আমাদের গন্তব্য নীলক্ষেতের আনোয়ারা হোটেল, লক্ষ্য আরেফ ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এলেন। আফতাব তাকে পতাকার ডিজাইন সম্পর্কে অবহিত করলেন। এই হলো আমাদের প্রাণপ্রিয় জাতীয় পতাকার ইতিহাসের প্রথম পর্যায়।

উনসত্তরের সফল গণঅভ্যুত্থানের পর বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক গণজাগরণ সুস্পষ্টভাবে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সত্তরের প্রায় অর্ধেক কাল সময় ধরে ছাত্রযুবসমাজের মধ্যে এ নিয়ে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ছাত্রলীগের অগ্রগামী অংশের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে স্বাধীনতা ছাড়া বাংলা নামের এই ভূখণ্ডের আপামর জনসাধারণের বাঁচার আর কোনো পথ খোলা নেই। তাই এই সময়কালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনের সময় এমন সব নতুন স্লোগান, আলোচনা বা কর্মসূচি নেওয়া হতে থাকে যাতে স্বাধীনতার ডাক শোনা যেত কান পাতলেই। এরই মধ্যে এসে পড়ছিল ৭ জুন। বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা বাস্তবায়ন এবং কারারুদ্ধ শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ছেষট্টি সালের দিনে ঢাকায় এক অভূতপূর্ব ধর্মঘট, হরতাল সংঘটিত হয়েছিল। শ্রমিক মনু মিয়াসহ অনেক শহিদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ।

সেই ৭ জুন পালন উপলক্ষে ছাত্রলীগের মধ্যে গড়ে তোলা জয় বাংলা বাহিনী একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত হলো ওইদিন পল্টন ময়দানে সকাল ১০টায় সামরিক কুচকাওয়াজের ধারায় বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানাবে। প্রশ্ন উঠল এই যে রেজিমেন্টাল কায়দায় সেলুট জানাবে, তো সেই রেজিমেন্টের একটা ফ্ল্যাগ তো লাগবে। ৬ জুন ইকবাল হলে (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক) বৈঠকে বসেন সাবেক ছাত্রনেতা কাজী আরেফ, আ স ম আবদুর রব, মনিরুল ইসলাম, শাজাহান সিরাজ। আমার স্পষ্ট মনে আছে ছাত্রলীগের জনপ্রিয় তরুণ নেতা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ স্বপন চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু এবং আরো কয়েকজন ছাত্রনেতা খুব উত্তেজনা উৎকণ্ঠায় পায়চারি করছেন ইকবাল হলের নিচে। এর মধ্যে হাসানুল হক ইনু বেজায় উদ্বেগে ছিলেন। কারণ এই রেজিমেন্টাল ফ্ল্যাগটা তৈরি করার মূল দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। যাক শেষপর্যন্ত সব উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে ছাত্রনেতারা জাতীয় পতাকার আইডিয়া দিলেন, যা আজকের বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

পতাকার বিবরণ শুনে আমি যারপরনাই খুশি। কারণ এটি সবুজ জমিনের ওপর উদীয়মান লাল সূর্যের সেই নকশা, যার ধারণা প্রয়াত ছাত্রনেতা আফতাব এবং এই অভাজন আমাদের নেতা কাজী আরেফকে দিয়েছিলাম উনসত্তরের ডিসেম্বর মাসের শীতকালে।

এখন পতাকার আইডিয়া তো পাওয়া গেল, কিন্তু এটি আঁকবে কে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের কুমিল্লার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা শিবনারায়ণ দাশ, যিনি অংকনে পারদর্শী, তিনি এসেছেন ঢাকায়। ফজলুর রহমান বাবুলকে পাঠানো হলো এস এম হলে শিবুদাকে নিয়ে আসতে। অপেক্ষায় আমরা, কখন আসবেন শিবুদা?

অবশেষে তিনি এলেন। এর আগে তাকে আমি দেখেছি কি না মনে পড়ে না। দেখলাম। যেন বাংলার শ্যামল রং গায়ে মেখে এক আত্মবিশ্বাসী দ্রাবিড় যুবক ইকবাল হলে এলেন। তার স্থান হলো শাজাহান সিরাজের সম্ভবত ১১৮ নম্বর কক্ষে। জ্যৈষ্ঠ নেতাদের একজন তাকে পতাকার নকশাটা কী হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। রং, তুলি ড্রইং করার কাগজ তিনি নিয়েই এসেছিলেন। শুরু হলো হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসে এমন এক কর্মযজ্ঞ, যে কাজের জন্য শিবনারায়ণ দাশ নামের একজন ছোটখাটো মানুষ নিজেকে পরম ভাগ্যবান পুরুষ হিসেবে ভাবতে পারবেন এবং আমাদের জাতীয় পতাকা বিনির্মাণে তার ভূমিকার কথাও আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে লাগাতার তিনি কাজ করে চলছেন। আর এ সময়কালে এক এক করে ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থি অনেক নেতা, সংগঠক তার কাজ দেখতে এসেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে স্বপন চৌধুরী, আ ফ ম মাহবুবুল হক, আফতাব আহমেদ, গোলাম ফারুক, রেজাউল হক মুশতাক, জিনাত আলী, শহিদ নজরুল, একরাম এবং আরো অনেকে। সম্ভবত প্রয়াত বাতেন চৌধুরীও এসে এক নজর শিবুদার এই অঙ্কনকর্ম দেখে গিয়েছিলেন এবং আমার সৌভাগ্য যে পুরো সময়টায় উপস্থিত থেকে আমিই একমাত্র ছাত্রলীগ কর্মী যে এই কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

অবশেষে এক সময় শিবুদা তার কাজ শেষ করলেন। তার দায়িত্ব সমাপ্ত হতে না হতেই হাসানুল হক ইনু, ইউসূফ সালাহউদ্দীনরা অনেকটা ঈগল পাখির মতো ছোঁ মেরে শিবুদার কাছ থেকে কাগজের উপর আঁকা

আমাদের প্রাণের পতাকার ড্রইংটা নিয়ে ছুটলেন সোজা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কারণ তখনও অনেক কাজ বাকি।

এখন প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক, কেন শিবনারায়ণ দাশের আঁকা পতাকার ড্রইংটা নিয়ে তারা উর্ধ্বশ্বাসে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির দিকে ছুটলেন। এর পিছনেও ছোট্ট কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। কাজী আরেফ আহমেদসহ ছাত্রনেতারা পতাকার ডিজাইন নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার পর তারা এ বিষয়ে কথা বলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মহান সংগঠক সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। আন্দোলন, সংগ্রাম, অভ্যুত্থান বিষয়ে অভিজ্ঞ সিরাজুল আলম খান ত্বরিৎ চিন্তাভাবনা করে প্রস্তাবিত পতাকায় যেখানে লাল সূর্যের অবস্থান, সেখানে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে দেওয়ার কথা বলেন। কারণ তিনি ভেবে নিয়েছিলেন লাল সবুজের এই পতাকা প্রকাশ্যে এলেই শত্রুপক্ষ বিভিন্ন অপপ্রচারে মেতে উঠবে। যেন কোনো ভুল বার্তা কোনো মহলকেই বিভ্রান্ত করতে না পারে, সেজন্যই এই সাবধানতা। বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত লাল-সবুজের পতাকা দেখলে এই ধারণা আসবে যে এই ভূখণ্ড নিয়েই আমাদের যত সংগ্রাম, আবেগ আর প্রলয়ংকরী ভালোবাসা। অতএব এই পর্যায়ে এই ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন যে বাংলাদেশের মানচিত্রটি একটু ট্রিকি। আমি কথাটা ড্রয়িংয়ের দৃষ্টি থেকে বলছি। যেমন আফ্রিকার দেশগুলো বেশিরভাগই একটা বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র বা ত্রিকোণাকৃতির। কিন্তু আমাদেরটা বেশ জটিল।

ছাত্রনেতা শিবনারায়ণ দাশ অঙ্কনে বেশ পারদর্শী, কিন্তু এ এক চ্যালেঞ্জিং অঙ্কন-কর্ম, যেখানে তার সীমাবদ্ধতা আছে। আমি বাংলার প্রস্তাবিত পতাকার রক্তিম সূর্যের ঠিক মধ্যিখানে আমাদের মানচিত্র সন্নিবেশিত করার কথা বলছি। আর এখানেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউসূফ সালাহউদ্দীন, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আবুল কাশেম এবং আরো কয়েকজন মিলে তিতুমীর হলের ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হকের কক্ষে যান। আমার জানা মতে এনামুল স্কেল, মেজারিং টেপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

নিয়ে ট্রেসিং পেপারের উপর মানচিত্রখচিত পুরো পতাকাটির প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

এরপরের কাজ আরো সূক্ষ্ম, আরো চ্যালেঞ্জিং। কারণ এটিকে পতাকায় রূপ দিতে হলে কাপড় লাগবে। এই কাপড় কে জোগাড় করেছিল সেটি নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে কামরুল আলম খান খসরু, কেউ বলেন লিটেল কমরেড রফিক। যদিও এটি বিরাট কোনো বিতর্কের বিষয় নয়।

কাপড় তো জোগাড় হলো, কিন্তু সেলাই করবে কে? ৪২ বলাকা ভবন, উনসত্তর পরবর্তী ছাত্রদের নির্ভরযোগ্য ঠিকানা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এর সঙ্গেই লাগোয়া একটি দরজির দোকান ছিল 'পাক ফ্যাশন' নামে। দোকানের স্বত্বাধিকারী একজন অবাঙালি, বিহারি। কিন্তু অত্যন্ত সদালাপী এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সবারই সদ্ভাব ছিল। রাত গভীর হতে চলেছে, হাতে নেই সময়। অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে তার কাঁধেই অর্পিত হলো পতাকা সেলাইয়ের কাজ। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেলাই করে দিলেন ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকাখানি। যা তার পরদিন রেজিমেন্টাল পতাকা হিসেবে মার্চ পাস্ট করবে জয়বাংলা বাহিনী পল্টন ময়দানে পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে।

পতাকাটির সেলাই কর্ম চলাকালীন বেশ কিছু ছাত্রলীগ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পতাকা তৈরি হওয়ার পর এটা ছাত্রলীগ নেতা ইনুর কাছেই ছিল। লাল, সবুজ আর সোনালি কাপড় দিয়ে তৈরি এই প্রাণের পতাকাটি নিয়ে ইনু ছুটলেন তার গন্তব্যে। রাত তখন গভীর।

এই যে আমাদের জাতীয় পতাকাটা শেষপর্যন্ত তৈরি হলো সেটি আমার জন্য এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। উত্তাল উনসত্তরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এক সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলের সবুজ ঘাসে বসে প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা, দৈনিক গণকণ্ঠের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আফতাব আর এই অভাজন যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলার পতাকার নকশা ঠিক করেছিলাম, সত্তরের ৬ জুন কাজী আরেফসহ ছাত্রনেতারা বসে হুবহু সেই নকশা সবুজ জমিনের ওপর উদীয়মান লাল সূর্যের সেই ডিজাইনই জাতীয় পতাকার নকশা হিসেবে সিদ্ধান্ত নেন। এক অনির্বচনীয় পুলকে, আনন্দে

ভেতরে ভেতরে আমি উচ্ছ্বসিত ছিলাম, যদিও বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে এই পতাকার নকশাকার কে এ নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। এই বিভ্রান্তির পিছনে অবদান রেখেছে তৎকালীন ছাত্রনেতা পতাকার সফল অংকন শিল্পী শিবনারায়ণ দাশের কিছু একান্ত গুণমুগ্ধ অনুসারী। তারা তাকে সব সময়ে স্বাধীন বাংলার পতাকার রূপকার হিসেবে উল্লেখ করেন তাদের লেখায় এবং কথায়। শ্রদ্ধেয় শিবনারায়ণ নিজ থেকে কখনো এ বিষয়ে সত্য উচ্চারণ করেননি, নিশ্চুপ থেকেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ২০০৭ অথবা ২০০৮ সালে চ্যানেল আইতে এই জাতীয় পতাকার ইতিহাস নিয়ে শিবুদার একটা সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল। আধ ঘণ্টার এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন অরুণ চৌধুরী। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আধ ঘণ্টা বেশ লম্বা সময়। প্রশ্নোত্তরে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন; কিন্তু সঞ্চালক যখন তাকে সরাসরি প্রশ্নাকারে বললেন, এই পতাকার ডিজাইনার তো আপনি। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, না, ডিজাইনতো ছিলই... অরুণ বেশ কয়েকবার এ বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু একবারও তিনি একথাটা বললেন না যে, পতাকার ডিজাইন আমাদের নেতাদের যৌথ চিন্তার ফসল। আমি তা এঁকেছি মাত্র।

এ সত্য উচ্চারণ করলে তার কি কোন অসম্মান হওয়ার ঝুঁকি ছিল? না কি একজন সত্যবাদী নেতা হিসেবে তিনি আরো বেশি সম্মানিত হতেন। তিনি তো ইতোমধ্যে পতাকা তৈরি সংক্রান্ত ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন।

আজ বাধ্য হচ্ছি এ কথা বলতে যে শিবনারায়ণ দাশ আমাদের প্রাণের জাতীয় পতাকার রূপকার বা ডিজাইনার নন, তিনি এর আঁকিয়ে, অঙ্কন শিল্পী। আমাদের মনে রাখা উচিত, জাতির জন্য সত্যটুকুই গুরুত্ব বহন করে। ব্যক্তিগত ইগো খুব সংক্ষিপ্ত জিনিস, খুব অল্পতেই শেষ হয়ে যায়।

ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যায়ে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে স্বাধীনতাপন্থি ধারাটির কিছু তৃণমূল কর্মী এবং নেতৃবৃন্দ সত্তরের ৬ জুন যে পতাকাটি তৈরি করেছিলেন, তা ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্ববাহী এক সৃজনশীল কর্ম। লাল-সবুজের মধ্যে সোনালি রঙের বাংলার

মানচিত্রখচিত এই সেই পতাকা যা ৭ জুন সকাল বেলায় পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর রেজিমেন্টাল পতাকা হিসেবে শোভা পায় এবং আ স ম রব, হাসানুল হক ইনু এবং কামরুল আলম খসরুর নেতৃত্বে সামরিক কুচকাওয়াজের সমাপ্তি পর্বে বাংলার জনগণমন অধিনায়ক বঙ্গবন্ধু মুজিবের হাতে অর্পণ করা হয়।

এই সেই বাঙালির প্রাণ পতাকা, যা ঢাকা নগর ছাত্রলীগের নেতা প্রয়াত শেখ জাহিদ, কাউসার চৌধুরীর মাধ্যমে রক্তঝরা একাত্তরের ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় জমায়েত ছাত্রজন সমুদ্রে ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রবের হাতে হস্তান্তর করা হয়; তিনি বিশাল ছাত্রজনতার বিপুল আনন্দ উল্লাস ধ্বনির মধ্যে পতাকাটি প্রদর্শন করেন দু হাত ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে। ২৩ মার্চ ঢাকা শহরসহ সারা বাংলা দেশে ছেয়ে গিয়েছিল (ক্যান্টনমেন্ট, প্রেসিডেন্ট হাউজ ব্যতীত) লাল-সবুজ আর সোনালি রঙে আঁকা বাংলা নামের এই দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় পতাকায়।

এই সেই পতাকা যাকে সমুন্নত রাখতে আমাদেরকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল এক মহান মুক্তিযুদ্ধে। তিরিশ লক্ষ বাঙালি নর নারীকে দিতে হয়েছিল প্রাণ বিসর্জন। এক নদী রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রিয় স্বাধীনতা এবং পরম আবেগমথিত প্রাণপ্রিয় জাতীয় পতাকা চির উড্ডীন রাখার যে অধিকার বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা অর্জন করেছি একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর, তা আমরা যেন ভুলে না যাই।

জয়বাংলা।

রায়হান ফেরদৌস মধু
(তৎকালীন ছাত্রলীগের কর্মী-সংগঠক)

দ্বিতীয় ভাগ

রবিউল আলম / ৭৫

সাইফুল ইসলাম / ৮০

সুমি ইসলাম / ৮৬

জাকিয়া খান / ৮৮

সিফাত রহমান / ৯৪

হাসানুল হক ইনু / ৯৬

সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে '১৫ই ফেব্রুয়ারী বাহিনী'র মিছিল। মিছিলে শেখ হাসিনাকে দেখা যাচ্ছে (চতুর্থ)

আমাদের সমস্যা!

(৪র্থ পৃঃ পর)

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন

ময়দানের উত্তাল জন

আজাদ

THE AZAD

প্রতিষ্ঠাতাঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

FINIS KILLS INSECTS

রেসকোর্সে বিরাট জনসমুদ্রে ভাষণদানরত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। —আজাদ

রেসকোর্সে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের প্রচার অভিযান শুরু

নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালালে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করা হইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভিবাদন

দাঙ্গাবাজের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

১০১ তম জন্মবার্ষিকীতে সুধীবৃন্দের শ্রদ্ধা

মওলানা আকরম খাঁর আদর্শ হইতে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

জনগণের সরকার নূতন করিয়া চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে

রাজশাহী বিভাগে বছরে ৫০ হাজার লোক পঙ্গু হয়

আবগারি লবণ কর প্রত্যাহার দাবী

অবিস্মরণীয় ৭ই জুন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে

কোয়েটায় কয়লা খনির বারুদাগারে ভয়াবহ বিস্ফোরণঃ ৩৩ ব্যক্তি নিহত

আগামীকাল থাদয়জা মিল চালু হইবে

আবহাওয়া

সাংবাদিক দলনের প্রতিবাদ

কাউন্সিল লীগের ভূমিকা ব্যাখ্যা

রহিম খানের ঢাকা উপস্থিতি

নয়াপেনে ভিয়েতকং অনুপ্রবেশ?

১৯৭০ সালের ৭ জুন

আমাদের সমস্যা

জাতীয় জীবনের বিভি...
ময়দানের উত্তাল জ...

আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচীতে শোষণহীন নয়া সমাজ ব্যবস্থার দিগদর্শন

অর্থনৈতিক প্রগতির ফলশ্রুতি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ওয়াদা

১৯৭০ সালের ৮ই জুন দৈনিক সংবাদ পত্রিকা

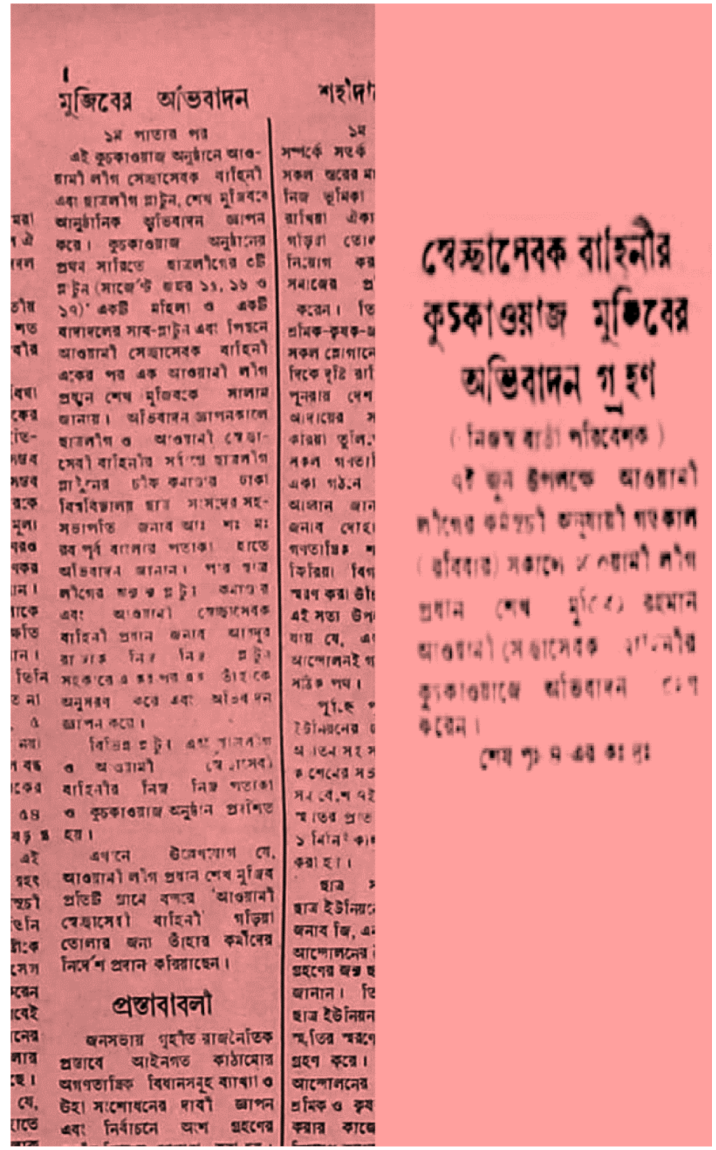
মুজিবের অভিবাদন

১ম পাতার পর

এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং ছাত্রলীগ প্লাটুন, শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জ্ঞাপন করে। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতে ছাত্রলীগের ৩টি প্লাটুন (সার্জেন্ট জহুর ১১, ১৬ ও ১৭)' একটি মহিলা ও একটি বাদ্যদলের সাব-প্লাটুন এবং পিছনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী একের পর এক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে সালাম জানায়। অভিবাদন জ্ঞাপনকালে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সর্বাগ্রে ছাত্রলীগ প্লাটুনের চীফ কমান্ডার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আ স ম রব পূর্ব বাংলার পতাকা হাতে অভিবাদন জানান। পরে ছাত্রলীগের প্লাটুন কমান্ডার এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান জনাব আব্দুর রাজ্জাক নিজ নিজ প্লাটুন সহকারে ও মঞ্চের সম্মুখে তাঁহাকে অনুসরণ করে এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করে।

বিভিন্ন প্লাটুন এবং ছাত্রলীগ ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নিজ নিজ পতাকা ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব প্রতিটি গ্রামে বন্দরে 'আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহার কর্মীদের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রস্তাবাবলী

জনসভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে আইনগত কাঠামোর অগণতান্ত্রিক বিধানসমূহ ব্যাখ্যা ও উহা সংশোধনের দাবী জ্ঞাপন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ মুজিবের অভিবাদন গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৭ই জুন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী অনুযায়ী গতকাল (রবিবার) সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

শেষ পৃঃ ৫ এর কঃ দ্রঃ

সংবাদ

Regd. No. DA-62 (SANGBAD) Gram : SANGBAD, Dacca.
Po. Box 1228 Phone : 243911

Monday June 8, 1970

রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা

রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভ

নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মব

আহ্বান ঃ ঐক্যজোটের প্রস্তাব

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ মুজিবের অভিবাদন গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রতিহত প্রয়োজন

ঐতিহাসিক ৩ রা মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃ চতুষ্টয় সর্ব জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন (ইশতেহার পাঠ এর পর) স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পরার শপথ গ্রহণ করেন।

৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন শাজাহান সিরাজ

ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ ১৯৭১। জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা- নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল হক ইনু স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করছেন এবং 'জয়বাংলা বাহিনী'র ডেপুটি কমান্ডার কামরুল আলম খান খসরু 'গান ফায়ার' করে স্বাধীনতার 'এক দফাকে' সামনে এনে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন।

১৯৭১ এর ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কুষ্টিয়া পতাকা উত্তোলন এবং গার্ড অব অনারের ছবি

২৩ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভিবাদন গ্রহণ। পত্রিকা ২৪ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

Wednesday, March 24, 1971

'৭১-এর তেইশে মার্চের সুরঃ

আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ

আজ ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের সম্ভাবনা

'কর্মপন্থা নির্ধারনের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন' —শেখ মুজিব

ক্ষমতা হস্তান্তর ও সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে

শেখ মুজিবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বৈঠক

মিঃ ভুট্টো ও তাঁর দোসররা জানিয়া রাখুন——

উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক

পরলোকে বিচারপতি আবদুল্লাহ

একমনাদের প্রতি মশিহুর রহমান

সবার সেরা

চান্দা ব্যাটারী সেল

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ স্বেচ্ছাসেক বাহিনী যশোর কালেক্টরেটের সামনে তৎকালীন নিয়াজ পার্কে পতাকা উত্তোলন করে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

২৩ মার্চ ১৯৭১, ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu raises the flag of independent Bangladesh before the jubilant crowd at Road 32 —23 March 1971

স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, যশোরে যা ঘটেছিল

রবিউল আলম

২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্রজনতার সমাবেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসু নিয়ে গঠিত) স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দেয়। ডাকসুর ভিপি আ স ম আব্দুর রব পতাকাটি তোলেন খবরটি যশোরে আমরা পাই পরদিন বিকাল বেলা। তখনকার দিনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র এসে পৌঁছাত সন্ধ্যার পর অথবা পরদিন সকালে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল পায়ে হেঁটে দূরত্ব অতিক্রম করার মতো, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বুকিং দিয়ে অপেক্ষা করতে হতো। কথা বলার জন্য লাইন পাওয়া যেত ৪/৫ ঘণ্টা পর। এখনকার দিনে এমনটা ভাবাই যায় না। কলাভবনের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো রূপরেখা আমরা পেলাম না। পতাকার নমুনা পাবার জন্য অপেক্ষায় রইলাম। ৩ মার্চ যশোরে পাকসেনারা টেলিফোন ভবনের সামনে মিছিলের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করলে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পাশের বাড়ির গৃহকর্মরত চারুবালা কর ওই গুলিতে শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধে যশোরের তিনি প্রথম শহীদ। ৪ মার্চ শহরে মিছিল চলাকালে একাংশ কালেক্টর ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। সেখানে ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা আলী হোসেন মনি, মোঃ রবিউল আলম, শেখ আব্দুস সালাম (জেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি) আব্দুল হাই, সরদার লুৎফর রহমান (শ্রমিক নেতা)। এছাড়া ছাত্রলীগের আরো নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। কালেক্টর ভানের পূর্বপাশে ভবন চূড়ায় উড্ডীন পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলে এবং ভবনে একটি কালো পতাকা টাঙ্গিয়ে দেয়। আব্দুল হাই লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠেন এবং পতাকাটি নামিয়ে আনেন। ১ মার্চের পর দুইদিনেই দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে

উঠে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশজুড়ে হরতাল পালিত হয়, বিভিন্ন জেলাতে পাকআর্মির গুলিতে শতাধিক মানুষ শহীদ হন। আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি হয় শতগুণ। প্রতিদিন রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়। ৩ মার্চ, ৭১ যশোরে একটি ঘটনা ঘটে যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। আন্দোলনরত জনসাধারণের দাবি ও মনোভাবের দিকে লক্ষ রেখে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা, ২ জন সিনিয়র সাংবাদিক ও কয়েকজন আওয়ামী নেতা একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যশোর থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে একটি পতাকা টাঙ্গিয়ে দেবেন। শহরে সেই অনুযায়ী পোস্টারিং করা হবে। বৈঠক হয়েছিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মোড়ে ‘সাপ্তাহিক নতুন দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুল হকের অফিসে তার উপস্থিতিতে। আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ মহব্বত আলী, ছাত্রলীগ নেতা আলী হোসেন মনি, মোঃ রবিউল আলম, আব্দুল হাই, মাহফুজুল হক (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) মহিউদ্দিন আহমেদ মহিন, সাংবাদিক আবদুস সালাম (সাপ্তাহিক মাতৃভূমি সম্পাদক)। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পতাকার ডিজাইন করা হয়। সবুজসহ তিন রঙা কাপড়ে তৈরি করা হয়, যাতে তিনটি সাদা তারা ছিল। এই পতাকা তৈরি হয় যশোর শহরের পুরাতন কসবা মহল্লায় ছাত্রলীগ নেত্রী সলেহা বেগমের বাড়িতে। তার মা এটি তৈরি করেন। ৪ মার্চ রাত ১০টার দিকে যশোর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঈদগাহ ময়দানে পতাকাটি টাঙ্গিয়ে দিয়ে আশপাশের এলাকায় ‘আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন’ কথাটি লিখে ব্যাপক পোস্টারিং করা হয়। পোস্টার লিখেছিলেন ছাত্রলীগ নেতা অশোক কুমার রায়। ভোরবেলা পাকিস্তান আর্মি এসে পতাকাটি নামিয়ে নিয়ে চলে যায়। পোস্টারগুলো খুঁজে খুঁজে ছিঁড়ে ফেলে। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার নমুনা যশোর আমাদের হাতে এল ৬ মার্চ। এটি ডাকযোগে যশোর শহরে ঘোপ সেন্ট্রাল রোড মহল্লায় অবস্থিত আমার বাড়ির ঠিকানায় (রবিউল আলম) আসে। কাগজে ছাপানো, সবুজের মাঝে কালবৃত্তের উপর সোনালি রংঙের মানচিত্রখচিত।

আমি যশোর জেলা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য ছিলাম। বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সিরাজুল আলম

খানের নেতৃত্বে আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদকে নিয়ে ১৯৬২ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ (স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস) গড়ে উঠে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে গোপন তৎপর স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস কাজের সাথে '৬৮ সাল থেকে আমি যুক্ত হই। '৬৯-এর শেষ দিকে যশোর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পাই। সেই সুবাদে কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস কমিটি পতাকার নমুনাটি আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। এটি পাবার পর আমি সকলকে অবহিত করি। নমুনাটি কীভাবে কাজে লাগানো হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে। ঠিক হলো কাপড় দিয়ে পতাকা বানাতে হবে। কখন কোথায় টাঙানো হবে, সে বিষয়ে তখন সিদ্ধান্ত হয়নি। ২ মার্চ থেকে যশোর শহরে স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল। প্রতিদিনই আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছে, রাজনৈতিক উত্তাপে উত্তাল হয়েছে দেশ। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর সব কিছু বদলে যায় আন্দোলনের ঢেউয়ে। স্বাধীনতার দাবিতে দুলতে থাকে দেশ। পাকিস্তানি শাসকের সকল গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে আমরা কিছু পতাকা বানিয়ে বিলি করি কর্মীদের ভেতর, তাদের বলা হয় পতাকাগুলো তাদের বাড়িতে টাঙ্গিয়ে দিতে। যশোর শহরে নীলরতন ধর রোডে ইপিআর এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার ছিল। লে. কর্নেল আসলাম ছিল এর কমান্ডিং অফিসার, সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর আব্দুল কাদির। দুজনেই পাঞ্জাবি। ৭ মার্চের পর থেকে বাঙালি ইপিআরদের প্রতিনিধি সিপাহি সাইদুর রহমান অত্যন্ত গোপনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মোশাররফ হোসেন এলএলবি (এমপিএ) এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। তিনি আমার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। তাকে আমি একটি পতাকা দিই (স্বাধীন বাংলার পতাকা)। রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির দিকে বাঙালি সেনা, ইপিআর ও পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর। তারা বিদ্রোহের পথ খুঁজছিলেন। ২৩ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গান স্যালুট দিয়ে পতাকা উত্তোলন করে। মঞ্চে ছিলেন সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা। যথাক্রমে আ স ম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী। ঢাকা সিটি ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল হকও মঞ্চে ছিলেন। পতাকা তুলেছিলেন

ছাত্রনেতা হাসানুল হক ইনু ও গান ফায়ার করেছিলেন কামরুল আলম খান খসরু। সেখান থেকে জয়বাংলা বাহিনী প্যারেড করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয় এবং তার বাড়িতে আরেকটি পতাকা টাঙ্গিয়ে দেয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ হানাদার বাহিনী প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা দিয়ে সর্বস্তরের জনগণকে তাদের বাড়িতে ও প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের পতাকা টাঙ্গানোর আহ্বান জানায়। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পতাকা তুলেছিল বাড়িঘরে, প্রতিষ্ঠানে। স্বাধীন বাংলার পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল যশোর শহর। ২৩ মার্চ সকাল ৮টায় জীবন বাজি রেখে যশোর সেক্টর অফিসে ৮ জন ইপিআর স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা টাঙ্গিয়ে দিয়ে পতাকাকে স্যালুট দেন। এরা হলেন হাবিলদার কাজী তবিবর রহমান, নায়েক বুরহান উদ্দিন, সিপাহি সাইদুর রহমান (যুদ্ধাহত বীর প্রতীক), সিপাহি আঃ মুতালেব, সিপাহি জয়নাল আবেদীন, সিপাহি আব্দুল হক, সিপাহি আব্দুল গণি ও সিপাহি ফারুক লস্কর। সামরিক শৃঙ্খলা ভেঙে এভাবে বেরিয়ে আসার নজির বিরল। এমনটা সেক্টর কমান্ডারের কল্পনাতেও ছিল না। স্বাধীনতার দাবিতে পতাকা উত্তোলনকারী এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তৎক্ষণাৎ শাস্তিমূলক কোয়ার্টার গার্ডে নেওয়া হয়। এই ঘটনা চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপে সব কিছু বদলে দিয়েছিল। বাঙালি ইপিআরগণ বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ২৮ মার্চ সকলে তারা বিদ্রোহ করে সেক্টর হেড কোয়ার্টার দখল করে নিলে সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল আসলাম পালিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেন। বিদ্রোহী ইপিআরদের একটি দল সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর আব্দুল কাদিরকে তার বাসভবনে গিয়ে হত্যা করে। যশোর এভাবেই মুক্তিসংগ্রাম সশস্ত্র পর্বে উপনীত হয়।

এদিন (২৩ মার্চ) আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। সকাল ১০টায় যশোর কালেক্টর ভবন প্রাঙ্গণে (তৎকালীন নিয়াজ পার্ক) যশোর জেলা ছাত্রলীগের সিদ্ধান্তে ছাত্রলীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (যাকে জয়বাংলা বাহিনী বলা হতো) আনুষ্ঠানিকভাবে রাইফেল (ডামি রাইফেল) নিয়ে প্যারেড করে। ওই প্যারেডে ৪৫/৪৬ জন অংশ নেয়। এ সময় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও প্যারেড অনুষ্ঠান করা হয়। প্যারেড সালাম

গ্রহণ করেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খান টিপু সুলতান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রবিউল আলম। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আলী হোসেন মনি ও ছাত্রলীগের নেতা একরামুল কবির (জেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি) প্যারেড পরিচালনা করেন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল মান্নান। আরো উপস্থিত ছিলেন মশিউর রহমান (লালদিঘির পাড়) আব্দুল হাই, অশোক কুমার, মিকাইল হোসেন মিন্টু প্রমুখ। প্যারেডে অংশ নেন ওমর ফারুক (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) সালেহা বোগম, সাবিহা বেগম, ডরথি দাস হিরা, সৈয়দ নাজমুল হোসেন মনা, ইকবাল হোসেন বাচ্চু, হায়দার গনি খান পলাশ, মোকারম হোসেন, আবু সাদ সন্টু, সাজ্জাদ হোসেন (জিএস, সিটি কলেজ) আবু হাসান মোহন, এস এম হোসেন শহিদ পুতু, সৈয়দ আব্দুল বাতেন, সৈয়দ আব্দুল মাজেদ, সৈয়দ আব্দুল কাদের, করজী মঈন (৭১ এ শহীদ), মোঃ আব্দুল্লাহ (দুলাল), কাজী আশরাফ মামুন, আবুল খায়ের আবদুল্লাহ প্রমুখ। পাকিস্তানি প্রশাসনের জেলা প্রশাসকের দপ্তর প্রাঙ্গণে এমন ঘটনায় জনগণের আবেগ উচ্ছ্বাস সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়ে।

যশোর

২৪-৬-২৪

[রবিউল আলম যুদ্ধকালীন বিএলএফ ডেপুটি লিডার (উপপ্রধান) বৃহত্তর যশোর জেলা। সাবেক সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বৃহত্তর যশোর জেলা।]

পতাকা পেলাম যেভাবে

সাইফুল ইসলাম

‘জনগণের নেতা হতে চাইলে জনগণ কী চায় সেটি বুঝার চেষ্টা করবে, জনগণ যা চায় তাই করবে, জনগণ যা শুনতে চায় সেটিই বলবে।’[১] তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতারা যান সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসায় দেখা করতে, তখন শেখ মুজিব একথা বলেন। তার আগেরদিন রাতে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের চাপে আগরতলা মামলা বাতিল করে মুক্তি দেওয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা একই সঙ্গে মুক্তি পেলেও তাকে আলাদাভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন চলছে রেসকোর্স ময়দানে। ওই সংবর্ধনা সভায় সেদিনই তাকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরেরদিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনা দেওয়া হবে মনি সিংহসহ অন্যান্য নেতাদের। বঙ্গবন্ধুর অন্ধভক্ত ছাত্রলীগের কর্মীরা তখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইত না, জনগণের শক্তিতে ছিল তাদের প্রচণ্ড আস্থা, যে আস্থার বলে তারা অচেনা ‘সোনারগাঁয়ে’ পৌঁছে যেত জনগণের কাছে শুনতে শুনতে। বর্তমান ইতিহাস চর্চার রেওয়াজ অনুযায়ী যদিও বলা হয় ‘অমুক নেতা এটি করেছে, তমুক সেটা বলেছে, তাই কাজটি হয়েছে।’ কিন্তু একটু গভিরভাবে ওই সময়ের ঘটনাবলীকে খুঁটিয়ে দেখলে প্রমাণ হয় যে, কথাটি সঠিক নয়। জনগণের ওপর আস্থা রাখায় সেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তৈরি হয় লাল-সবুজের মাঝে মানচিত্র আঁকা পতাকা, যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

তখনকার দিনে জনগণ যেটি করতে চেয়েছে, ছাত্রলীগ নেতারা জনগণের সে আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় করেছেন মাত্র। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

অনেক কিছুই করেছে, কিন্তু জনগণ যেটি গ্রহণ করেনি সেটি বাতিল করতেও দ্বিধা করেনি ছাত্রলীগ। যেমন সত্তরের নির্বাচন বর্জন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্লোগান তোলার চেষ্টা করে ছাত্রলীগের একটি অংশ। কিন্তু সেটায় জনগণ সাড়া দেয়নি বলে তা বাতিল হয়ে যায়। আসলে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঠিক সমন্বয় করতে পারার কারণেই জনগণ 'কলাগাছ' অর্থাৎ ছাত্রলীগ তথা ছাত্রদের নেতা বানিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে, লাফিয়ে পাহাড় পার হয়েছে। নইলে পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী অনেকেই পতাকা বানিয়েছে, লড়াই করেছে স্বাধীনতার জন্য, কিন্তু তা সফল হয়নি। গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত কৃষকের সন্তানদের সংগঠন ছাত্রলীগকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে গেছে জনগণ। এর কারণ ছাত্রলীগ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে আর অন্যরা তা করতে পারেনি।

ষাটের দশকে গণতন্ত্র এবং দুই পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রতিবাদে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠতে থাকে বাংলার জনগণ। সে ক্ষোভ-বিক্ষোভে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হিসেবে কাজ করে ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা। তার আগে '৬৮-র প্রথমদিকে শুরু হয় আগরতলা মামলা। সে মামলার বিবরণী প্রতিদিন বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপা হতে থাকে শেখ মুজিবকে গণবিচ্ছিন্ন করার জন্য। অপরদিকে, ১১ দফা আন্দোলনে মাঠে স্লোগান হিসেবে আসে ৬ দফা ও ১১ দফা মানতে হবে। এভাবেই ১১ দফার আন্দোলনের মধ্যে ৬ দফা অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীক্ষ্ণ হয়। মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি চাই— স্লোগানের মধ্য দিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের ছাড়িয়ে মুজিব হয়ে ওঠেন পূর্ব বাংলার প্রধানতম জননায়ক। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রেসকোর্স ময়দানের ছাত্র-জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আন্দোলনের চাপে একসময় আগরতলা মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা করে পাকিস্তান সামরিক সরকার। তার আগে বাংলার জনগণের মনোভাব বুঝতে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহুরকে। এ ঘটনায় জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, প্রভাব পড়ে মিছিলে। স্লোগান ঘুরতে থাকে, আগের স্লোগান প্রাচীন হয়, আসতে থাকে নতুন নতুন স্লোগান। মিছিলে স্লোগানে

জনগণের মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে থাকে। মিছিলের প্রধান স্লোগান হয়ে ওঠে 'জেলের তালা ভাঙ্গব, শেখ মুজিবকে আনব।' 'জহুরের রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্র।' ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ধর্মঘট শাসকের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। আগরতলা মামলার বিচারকের বাসভবনে আগুন দেয় জনতা, এক কাপড়ে পালিয়ে বাঁচে সে। হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে মুসলিম লীগ নেতাদের বাড়ি, তাদের পত্রিকা অফিসে। জনতার মিছিল থেকে অন্যান্য নেতাদের পিছনে ফেলে বাংলার একক নেতা হয়ে উঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। এভাবেই ১৫ ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিবস। অবশেষে জনতার আন্দোলনের চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানের সামরিক শাসক।

বাংলাদেশের পতাকা তৈরির কাহিনিও জড়িয়ে আছে জনতার আন্দোলনের মধ্যে। আন্দোলনের ইতিহাস পুঙ্খানুপঙ্খ না বুঝলে পতাকা তৈরির ইতিহাস বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে, মনে হয় এটি কোনো নেতার মস্তি-প্রসূত ঘটনা। নেতারা মাথা থেকে বের করে কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আর সেভাবেই নির্মিত হয়েছে স্বাধীনতার পতাকা। কিন্তু জনগণের আন্দোলনের ইতিহাস ঘাটলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জনতার আন্দোলনই বাঙালি জাতির পতাকা তৈরি করেছে, নেতাকর্মী বা সংগঠন উপলক্ষ মাত্র।

১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরের প্রথম মৃত্যু দিবস। '১৫ ফেব্রুয়ারি পালনের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনা ধারণকারী সংগঠন ছাত্রলীগ জনগণের মাঝে স্বাধীনতার স্বপ্ন আরো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটু ভিন্নভাবে দিবসটি পালন করার পরিকল্পনা করে।'[২] এজন্য গঠন করা হয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, নাম দেওয়া হয় ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী। মিছিলটি সাধারণ মিছিল হবে না, হবে 'জাঁকজমকপূর্ণ'— এটিই সিদ্ধান্ত। মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে কুচকাওয়াজ করে আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে সার্জেন্ট জহুরের কবরে শ্রদ্ধা জানাবে। সে মিছিল জাঁকজমকপূর্ণ করতে স্বাধীনতাপন্থিদের শুরু হয় প্রাণপণ চেষ্টা। সাদা জামাপ্যান্টের সাথে ডান হাতে থাকে হলুদ কাপড়ের ওপর লাল অক্ষরে লেখা ব্যাজ 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী'। সবাই পরে সাদা কাপড়ের জুতো।

মিছিল আকর্ষণীয় করতে সংযোজিত হয় বাদন দল। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে থাকে প্ল্যাকার্ড, যাতে লেখা 'জহুরের রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্র।' এভাবেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন রূপান্তর ঘটতে থাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে। স্বাধীনতার পতাকা তৈরির ভ্রূণ সৃষ্টি হয় সার্জেন্ট জহুরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে 'জাঁকজমকপূর্ণ' কুচকাওয়াজের আকাঙ্ক্ষা থেকে।

১৯৭০ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। সে কাউন্সিলকে সামনে রেখে সমগ্র দেশ থেকে আসবে আওয়ামী লীগের ডেলিগেটরা। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে দিতে ৭ জুন পল্টন ময়দানে শ্রমিক সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেয় স্বাধীনতাপন্থী নিয়ন্ত্রিত আরেক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা সেখানে শেখ মুজিবকে অভিবাদন জানাবে। সেই সমাবেশে অভিবাদন জানাবে স্বাধীনতাপন্থিরাও। আবারো স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হয়, এবারে নাম হয় 'জয়বাংলা বাহিনী'। এবারও সিদ্ধান্ত হয় র‍্যালি হবে 'জাঁকজমকপূর্ণ'। 'সুসজ্জিত সাধারণ র‍্যালি না করে রণমুখি ধারণা-বিন্যাসের প্রয়োজনে পোশাক থেকে শুরু করে একটি কুচকাওয়াজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের পোশাকের রঙ সাদা করা হয়। সবার জন্য সাদা কাপড়ের জুতা, মাথায় পরার জন্য একটি টুপি তৈরি করা হয়। টুপিটি অনেকটা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সামরিক পোশাকের সাথে ব্যবহৃত টুপির মতো। তবে টুপির রং হয় কালচে সবুজ এবং নিচের দিকে টকটকে লাল রঙের একটি মোটা ফিতার মতো পট্টি। টুপির সামনে গোল করে বসানো হলুদের মাঝে 'জয়বাংলা' লেখা, যা টুপির সঙ্গে সেপটি পিন দিয়ে আটকানো। ওই টুপি দিয়েই জয়বাংলা বাহিনীর একটা প্রতীকী রং দেওয়া হয়।' [৩] চূড়ান্ত মহড়ার আগে র‍্যালিকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করতে যন্ত্রীদলকে সাজানোর চিন্তা করা হয়। তখন টুপির জন্য সংগৃহীত কাপড় দিয়ে বাদ্যযন্ত্রীদের পিঠে ঝোলাতে কালচে সবুজের কিনারায় লাল পট্টি দেওয়া এক খণ্ড কাপড় পিঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। চূড়ান্ত মহড়া শেষ হয় ৬ জুন সন্ধ্যায়। তারপর মনে হয় 'জয়বাংলা বাহিনী'র একটি পতাকা হলে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত হবে অনুষ্ঠান। সে অনুযায়ী সংগৃহীত কাপড়ে কালচে সবুজের ঠিক মধ্যখানে পরিমিত আকারে লাল বৃত্ত দিয়ে পতাকা তৈরি করা হয়। এর সবটাই হয় অনানুষ্ঠিকভাবে, মিছিলকে জাঁকজমকপূর্ণ

করতে গিয়ে। এই কাজে যেহেতু তদারকির দায়িত্বে ছিলেন নিউক্লিয়াস নেতা কাজী আরেফ আহমেদ, তাই নিউক্লিয়াসের তিন জনের তিনিই শুধু জানতেন উল্লিখিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।

সিরাজুল আলম খানকে ঘিরেই ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল, তাই জয়বাংলা বাহিনীর পতাকার জন্য তার অনুমতির প্রয়োজন মনে করেন নেতৃস্থানীয় সংগঠকেরা। তারা যান সিরাজুল আলম খানের কাছে। ছাত্রনেতারা পতাকাটিকে জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা হিসেবে তার কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি পতাকা দেখেন, কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। সিরাজুল আলম খানকে ঘিরেই যখন সবকিছু আবর্তিত হচ্ছিল, তখন বুঝা যায় যে তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তা প্রকাশ করছেন। তিনি বলেন– 'যে নাম দিয়েই পতাকা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তাকে জনগণের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পতাকা বলে ভেবে নিতে কোনো বাধা থাকবে না।' 'বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাবিষয়ক আন্দোলনকে অনেকেই যুক্ত বাংলার কথা বলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই বিরুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে।' [৪] অনেক আলোচনার পর বৃত্তের মাঝে পূর্ব বাংলার মানচিত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এভাবেই অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড তখন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।

'কাজ করতে করতে কাজী হওয়া'র প্রবাদের কথা এ পরিস্থিতিতে স্মরণ করে বলা চলে, ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী 'জাঁকজমকপূর্ণ' করার ধারাবাহিকতায় আসে জুন মাসের জয়বাংলা বাহিনী। সেই 'জাঁকজমকপূর্ণ' করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা। এ পর্যন্ত সবকিছুই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক, সকলের মিলিত কাজ। সিরাজুল আলম খানের কাছে আসার পরেও অনানুষ্ঠানিকভাবেই কাজের অগ্রসর হওয়ার দাবি করা যায় এজন্য যে, নিউক্লিয়াসের সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩ জন। কিন্তু এখানে তারচেয়ে বেশি লোকের উপস্থিতি দাবি করা হচ্ছে, তাই এটি নিউক্লিয়াস কি না সে প্রশ্ন তোলাই যায়। কারণ এখানে নিউক্লিয়াসের অন্যতম সদস্য আব্দুর রাজ্জাকের অনুপস্থিতি। যাহোক, এটিও তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকার ইতিহাস নয় কারণ, এটি জয়বাংলা বাহিনীর পতাকার ইতিহাস এবং কোনো একসময়ে বাংলাদেশের পতাকা হতে পারে বলে ধারণা মাত্র।

তবে সেই পতাকাই ইতিহাস সৃষ্টি করে **১৯৭১** সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে, যখন জাহিদ হোসেনের হাতে একটি পতাকা দেখা যায়। উপস্থিত ছাত্র-জনতা সে পতাকাকে 'একটা কিছু' হিসেবে দেখার জন্য উদগ্রীব। পতাকা উত্তোলনের ঘটনা যে পরিকল্পিত নয় তা সহজেই বোঝা যায়। মুহুর্মুহু স্লোগানের মধ্যে সে পতাকা হাতে তুলে নেন আ স ম রব। ঘোষণা করেন এ পতাকাই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, এ বলেই তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটান। পতাকাটি তার পরিচিত এবং তিনিও তখন জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতেন বলেই হয়তো এটি সম্ভব হয়েছে। আর বাঙালি জাতি পেয়েছে তার স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

১. মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশ ফোর্স– বিএলএফ, শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন। পৃষ্ঠা **১৬**। অঙ্কুর প্রকাশনী।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র– মনিরুল ইসলাম। পৃষ্ঠা- **১১০** । জ্যা পাবলিকেসন্স- ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র– মনিরুল ইসলাম। পৃষ্ঠা- **১২৭**। জ্যা পাবলিকেসন্স– ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র– মনিরুল ইসলাম। পৃষ্ঠা- **১২৮**। জ্যা পাবলিকেসন্স– ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা। সাবেক দপ্তর সম্পাদক, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি। আহ্বায়ক– সিরাজগঞ্জের গণহত্যা অনুসন্ধান কমিটি।

সাইফুল ইসলাম
মুক্তিযোদ্ধা লেখক, রাজনৈতিক সংগঠক কর্মী

কুষ্টিয়ায় পতাকা উত্তোলন

সুমি ইসলাম

আমার আব্বা তার যুদ্ধ দিনের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ' বইতে। সেখান থেকেই চুম্বক অংশ তুলে ধরলাম।

আমার ছোট ভাই শামসুল হাদী ছিল কুষ্টিয়া জেলার নিউক্লিয়াস সাত সদস্যর অন্যতম সদস্য। জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। হাদী প্রচণ্ড সাহসী, স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত আছে। আর আমি ছিলাম ঠিক ওর উল্টো। খুব ভিতু ছিলাম আমি। আন্দোলন-মিটিং-মিছিলে কখনোই যেতাম না। বিএসসিতে ভর্তি হয়েছি, তখন উনসত্তর সাল; একদিন মিছিল দেখতে গেলাম, চারদিকে টিয়ার গ্যাসের সেল ছুড়ছে পুলিশ, একটা সেল এসে আমার পায়ে লাগল। মিটিং-মিছিলে কখনো যাই না, তাও আমার ওপর টিয়ার সেল ছুড়ল, ভীষণ রাগ হলো। কোথা থেকে সাহস এসে মনে বাসা বাঁধল, একটা ইটের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে পুলিশের দিকে ছুড়ে মারলাম। সেই থেকে ভয় গেল ভেঙে। এরপর থেকে চলমান আন্দোলনে নিয়মিত অংশ নিতে থাকলাম।

আন্দোলন তখন তুঙ্গে। একদিন মিছিলে গেছি, কুষ্টিয়া থানার ওসি হাফিজুর রহমান এসডিওর বাড়ির সামনে (কোর্ট স্টেশনের পিছনে) মিছিলে গুলি চালায়, আমার সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল আব্দুর রাজ্জাক। সেদিন ওর রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিয়েছিলাম, 'ছয় দফা আন্দোলনকে বেগবান করে ছাত্র সংগ্রাম (নিউক্লিয়াস) পরিষদের এক দফা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেব।' ছোট ভাই হাদীর পরামর্শে রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলাম, স্বাধীনতার পক্ষে গোপন সংগঠনের কাজ শুরু করলাম। কুষ্টিয়া

সরকারি কলেজে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হলাম। আমার মা আমাদের দুই ভাইকে সাহস যুগিয়ে যেতেন।

তিন মার্চ উনিশ শ একাত্তর, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হবে। হাদী মা'কে একটা পতাকা বানিয়ে দিতে বলে। মা নিজ হাতে পতাকা বানিয়ে তিন মার্চ ভোরে নিজ বাড়িতে পতাকা তুলে দেন। বাড়ির সঙ্গেই খেয়াঘাট, হাজার হাজার লোক নৌকা থেকে নেমে সেদিন পতাকায় সেলুট দিতে দিতে চলে গেছে। সেদিন মা হাদীর হাতে পতাকাটা তুলে দিয়ে বলেছিল, 'যে পতাকা তোর মা তোর হাতে তুলে দিল, সেই পতাকা যেন মাটিতে না নামে।'

'৭১-এর ৩ মার্চ কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ মাঠে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় লাল সবুজের ছয়টি তারকাখচিত পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে উড়িয়ে দেয় কুষ্টিয়া জেলা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আব্দুল জলিল। স্বাধীন বাংলার ইশতেহার পাঠ করে কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীন বাংলা সেলের নেতা শামসুল হাদী। মারফত আলী, আব্দুল মোমেন, শামসুল হাদীর নেতৃত্বে সেদিন গঠিত হয় জয়বাংলা বাহিনী।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালিত হবে। সেদিন সারাদেশে কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হবে।। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ মার্চ ১৯৭১ কুষ্টিয়া হাইস্কুল মাঠে জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজে হাদী স্বাধীন বাংলার মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলন করেন। গোলাম কিবরিয়া এমপি জয়বাংলা বাহিনীর সালাম গ্রহণ করেন। মারফত আলী সেলুট প্রদান করে।

যুদ্ধকালীন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী হাদীর বাড়ি গান পাউডার দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

সুমি ইসলাম
(লেখক)

পতাকার কাছেই ফিরে আসা

জাকিয়া খান

'ইউ লুক গ্রেইট উইথ দ্যাট।' 'থ্যাংক ইউ। দিস ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। টু ডে ইজ আওয়ার ভিক্টরি ডে।' কপালে লাল-সবুজ পতাকা বাঁধা মানুষটি জার্মান দম্পতির প্রশংসার জবাবে বলেছিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ৪২ মিটার উঁচু 'ইন্ডিয়া গেট' বা 'দিল্লি মেমোরিয়াল' এর দেয়ালে ভারতীয় সেনাদের খোদাইকৃত নাম দেখছিল তারা। জাতীয় বীরদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত স্থাপনা তো এমনই উঁচু হবার কথা। সত্তর হাজার নাম! তখনও ফুলার রোডের সড়কদ্বীপে 'স্মৃতি চিরন্তন', জগন্নাথ হলের 'গণহত্যা ফলক', কলাভবনের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের নামফলক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' তৈরি হয়নি। দেখা হয়নি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মিত 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক'ও। একটা ঘোর কাজ করছিল। সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ৪৬ মিটার উঁচু। খুব কাছ থেকে পুরোটা অনুধাবন করা যায় না। বার বার দেখতে হয়। বিশালত্ব বুঝবার জন্য হয়তো কিছুটা দূরত্ব প্রয়োজন।

সেদিনই যাওয়া হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীকে উৎসর্গ করে নির্মিত স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্সে। জওহরলাল নেহেরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত সেখানে। ঢোকার সময় যতটা না বড় লাগে, ভেতরে গাঁদা ফুল বিছানো কালো মার্বেলের মঞ্চ আর চারপাশ ততটাই বিশাল। পরের গন্তব্য ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল। ঢুকতেই কাচঢাকা পথে জবা ফুল রাখা। ভেতর থেকে বের হওয়ার সময় ইন্দিরা গান্ধীর গুলি লেগে পড়ে যাওয়ার জায়গাটিই কাচ বাঁধাইকৃত। প্রতিদিন জবা ফুল দেওয়া হয় নৈবদ্য হিসাবে। কুতুব মিনারও সেদিনই দেখা।

২০০৮ সাল। ডিসেম্বর মাস। বাইশ জনের দলে গিয়েছিলাম ভারত দর্শনে। মাঝে বিজয় দিবস পড়বে, সবুজ-সাদা জামা (তখন লাল একেবারে পরা হতো না বলে পোশাকে লালের ভাগ ছিল খুব কম) আর একটা ছোট পতাকা সঙ্গে নিয়েছিলাম। ১৬ তারিখ সকালে তৈরি হয়ে বের হলে কপালে বাঁধা পতাকা দেখে সবার হর্ষধ্বনি। পুরোটা দিন পতাকাটা সঙ্গে ছিল, হয় কপালে নয় হাতে বাঁধা। যদিও পতাকা এভাবে বহন করা নিয়মবহির্ভূত। অনেকেই ফিরে তাকিয়েছিলেন, সেই জার্মান দম্পতি কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সারাদিন ধরে এমন সব স্থাপনা দেখতে দেখতে মন ভারাক্রান্ত একাত্তরে নিজ দেশের প্রাণদানকারী মানুষগুলোর জন্য। কী অদ্ভুত যোগাযোগ। আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ এই দিনটির পিছনে যে দেশের অনেকটা ভূমিকা, সেই দেশের বিশেষ জায়গাগুলোর দর্শনলাভ ঘটল সেদিনই।

পঞ্চপাণ্ডবের একজন পাড়ি জমাচ্ছে মার্কিন মুলুকে। যাওয়ার আগে হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়েছিলাম। বিশাল সাইজের পতাকাটা দেখে অবাক চাহনি। বলেছিলাম বাংলাদেশকে সঙ্গে রেখো। কাছের কেউ চিরতরে দেশ ছাড়লে একটা পতাকা উপহারের তালিকায় থাকে।

'আমি পতাকায় শিখি সংগ্রাম,
আমি পতাকায় ওড়াই চেতনা
পতাকা আমার সাহসী জননী
পতাকা আমার হৃদয়ে আঁকা।'

অন্তর্জালও এখন জানার আরেকটা মাধ্যম। সেখানেই পরিচয় লিনু হকের সঙ্গে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও নিজের জানা আর বোঝাটাকে প্রকাশে সোচ্চার তিনি। ততদিনে মুক্তিযুদ্ধকে জানার আগ্রহ বেড়েছে। বেড়েছে মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতিকে বোঝার আগ্রহও। দেখা আর জানার বাইরের দিকটা ক্রমেই উন্মোচিত হতে থাকে সামনে।

ছোটবেলায় সাধারণ জ্ঞান বইয়ে পড়েছি জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান। ১০:৬ দৈর্ঘ্যপ্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার পতাকার মাঝের লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। গাঢ় সবুজ রং তারুণ্যের উদ্দীপনা ও গ্রামবাংলার সবুজ শ্যামল প্রকৃতির প্রকাশ আর লাল বৃত্তটি স্বাধীনতার নতুন সূর্যের প্রতীক। পতাকা দিয়ে রেলগাড়ি,

মোটরযান অথবা নৌযানের সামনের অথবা পেছনের অংশ ঢেকে দেওয়া যাবে না। পতাকা কখনো তার নিচের কোনো বস্তু স্পর্শ করবে না। পতাকা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে নিম্নমুখি করা যাবে না। পতাকা দ্রুত উত্তোলন করতে হবে এবং সসম্মানে নামাতে হবে। পতাকা সর্বদা ঊর্ধ্বে এবং মুক্তভাবে থাকবে। পেশাগত জীবনে এমন ১৪টি নিয়ম পড়িয়েছি ছোটদের ক্লাসে। তাই হয়তো সামনের বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলার বারান্দায় টানানো পতাকাটি ২৬ মার্চে উত্তোলিত হবার পর এখনও ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে কষ্ট হয়; চিৎকার করে নামানোর কথা বলতে চেয়েও পারি না। অনেক সময় খেলার মাঠে জয়ী দলের কারো কারও জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ আবেগাপ্লুত করে আমাদের।

লিনু হক আপা ভুল মানতে নারাজ। শিব নারায়ণ দাশ গত হবার পর সর্বত্র তার নামের সঙ্গে 'জাতীয় পতাকার রূপকার' আখ্যাটিতে প্রবল আপত্তি জানান। রূপকার, নকশাকার ইত্যাদির পিছনের ঘটনা তুলে আনতে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। আমরাও অনেকে বিষয়টিকে সঠিকভাবে দেখার আগ্রহ পাই এবং লিনু আপার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনুভব প্রকাশে ব্রতী হই।

কলেজে পড়ার সময় একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল বন্ধুরা মিলে। অপরাজেয় বাংলা, মধুর ক্যান্টিন, ডাস চত্বর, পাঠাগার ভবন দেখার পর বসেছিলাম বটতলায়। সঙ্গে থাকা এক বন্ধুর কাছে জেনেছিলাম এখন যে বট গাছটি আছে, তা ১৯৭১ সালে পতাকা উত্তোলনের দিনের বটগাছ নয়। একাত্তর সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জায়গাটির মর্যাদা নষ্ট করতে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল গাছটি। যদিও একাত্তরে ২ মার্চ এত বেশি জনসমাগম হয়েছিল যে ওখানে না করে কলাভবনের গাড়ি বারান্দার ওপরে উঠে বক্তৃতা করে পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীনতার পর '৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সিনেটর রবার্ট কেনেডি ঠিক আগের গাছটির জায়গাতেই বর্তমানের বটগাছটি রোপণ করেন। স্বাধীনতার আগে এবং পরে এই বটতলা বহু ইতিহাসের সাক্ষী। স্থানটির এখন বেশ পরিবর্তন হয়েছে, বটবৃক্ষটি ক্রমে মহিরুহের আকার লাভ করেছে। প্রায়ই যাওয়া হয়। প্রতিবারই চোখে পড়ে কোনো না কোনো মা-বাবা সন্তানসহ এসে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। এভাবেই ইতিহাস পরের প্রজন্ম বয়ে নিয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বন্ধুরা থাকত মোহসিন হলে, মনা ৪৩৭ আর ৪০৪ এ রোমান। চুরানব্বই সালে মোহসিন হলের ৪৩৭ নাম্বারে আমরা দুই বন্ধু গিয়েছিলাম জ্বরাক্রান্ত মনা আলমকে দেখতে। ওই হলটার পাশেই ছিল জহুরুল হক হল। ওখানে ২৪৮ নাম্বার রুমে থাকত আরেক বন্ধু নজরুল ইসলাম। শুরুতে না জানলেও বেশ অনেক পরে হল অডিটোরিয়ামে ছাত্র ইউনিয়নের এক অনুষ্ঠানে এম এম আকাশের বক্তব্য থেকে ও জেনেছিল ১১৮ নং কক্ষের পতাকা তৈরির কথা। বিশাল একটা পুকুর ছিল, হলের অনেকেই গোসল করত। জানালায় কোনো গ্রিল ছিল না। রাতে বন্ধ না করে ঘুমালে প্রচণ্ড বাতাসে কাপড়চোপড় উড়িয়ে নিয়ে যেত। আমার তখন জানা ছিল না ১৯৭০ সালের ৬ জুন পতাকা এই হলের তৈরির কার্যক্রম। তাহলে হয়তো একবার দেখতে যেতাম। আমি সংযুক্ত ছিলাম শামসুন্নাহার হলে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ১৭ নং আসামি হিসেবে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে '৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের নামানুসারে এই হল। '৫৭ সালে আল্লামা ইকবাল এর নামানুসারে তৈরি এই হলের নাম জহুরুল হক হল করা হয় '৭২ সালে। ২০১৩ সাল থেকে হয় ' শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল'। আমাদের সময় মেয়েদের হলে ঢুকার সময় ছিল সন্ধ্যা ৬টা, অথচ ছেলেদের হলে রুম পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ছিল মেয়েদের।

বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের প্রথমদিন সকালে সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বাচ্চারা পুরো গানটা গাইছিল। আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ, দুচোখে পানি। সাধারণত জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন গাওয়া হয়। কিন্তু একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পুরো গান শুনে সিক্ত আমি। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চও পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পতাকা তোলার সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়েছিল। ২০০9 থেকে স্কুলে সপ্তাহের কর্মদিবসগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত শুরু হলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। কত ত্যাগ, রক্ত, মৃত্যুর পর পাওয়া এই দেশ, এই মানচিত্র, এই পতাকা। কবি সুনির্মল বসু মতো বলতে ইচ্ছে করে—

'এই তিনরঙা পতাকার মাঝে
লুকানো যে ইতিহাস,
ছড়ানো যেসব গৌরব-গাথা,
জড়ানো যে বিশ্বাস,
তুলনা তাহার মিলিবে কোথায়?'

২০২৪ সালের ১৯ মে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া জয় করে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান বাবর আলী। পেশায় চিকিৎসক এই পর্বতজয়ী বলেন, 'পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট এবং লোৎসের চূড়ায় উঠে যখন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়েছি, তখন উপরে ওঠার সব কষ্ট ভুলে গেছি। হিমালয়ের এভারেস্ট এবং লোৎসের চূড়ায় দেশের পতাকা ওড়াতে পেরে আমি গর্বিত।' ২০১০ সালের ২৩ মে মুসা ইব্রাহিম পৃথিবীর শীর্ষবিন্দু এভারেস্টে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এ পর্যন্ত ৫ বার এভারেস্টে লাল-সবুজ পতাকা ওড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। আমাদের গৌরবের যেকোনো বিষয়ে আমরা পতাকার কাছে ফিরে আসি।

১ জুলাই ২০২৪ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখালেন আশিক চৌধুরী। উড়ন্ত বিমান থেকে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় ভারতের স্কাইড্রাইভারকে পেছনে ফেলে দুটো রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েন। গিনেসের 'গ্রেটেস্ট ডিসট্যান্স ফ্রিফল উইথ আ ব্যানার/ফ্ল্যাগ' শাখায় এটি নতুন রেকর্ড। এই যে পৃথিবীব্যাপী এত আয়োজন, যেখানে পতাকার ব্যবহার হয়; সেখানে লাল-সবুজ পতাকাটাই বাংলাদেশকে তুলে ধরে সকলের কাছে। এমনকি জাতীয় বীরদের সম্মান জানাতেও।

'যদি এমন কোনো ব্যবস্থা থাকত যে আব্বু বেঁচে থাকতে একটা ডেমো দেখানো যেত পুরো প্রক্রিয়াটার। আজ, এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে সেটার, তাহলে হয়তো আব্বু খুব খুশি হতেন। হয়তো বলতেন, আমাকে এমনভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে, আমাকে!' ২২ মে ২০২৪ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মীর আখতার হোসেন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ মর্যাদায় সম্মান জানানো হয়। কন্যা মীর ফাহরিয়াল হোসেন এবং মীর ফারহানা হোসেনের ঐকান্তিক ইচ্ছা কোনোমতেই যেন এই প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে।

ফাহরিয়াল বলছিল, ম্যাজিস্ট্রেট কফিনে সালাম প্রদর্শন করলেন, জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হলো, পুলিশের দলটি গার্ড অব অনার দিল, বিউগলে করুণ সুর, এক মিনিট নীরবতা শেষে জানাজা পড়া হলো। পুরো প্রক্রিয়াটা চলার সময় আমরা দু বোন বলছিলাম, ইশ আব্বু যদি এটি নিজ চোখে দেখতে পারতেন! জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আহত হবার পরও ওই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সবাই যুদ্ধে জড়িত ছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল বাড়িঘর। এমন সম্মানলাভের অধিকারী হবেন ভেবে তারা অংশগ্রহণ করেননি। তার সন্তান হিসাবে শেষ যাত্রায় এমন সম্মানপ্রাপ্তি আমাদের অনেকখানি তৃপ্তির জায়গা।

কাছাকাছি অনুভূতি মুক্তিযোদ্ধা জি, এম, এম শাহাবউদ্দিন এর কন্যা সঞ্চিতা জামানের। বলছিল, আমি যে কতজনকে ওই ভিডিয়ো পাঠিয়েছিলাম। কফিনজোড়া একটা বিশাল পতাকা! লাল সূর্যটা ঠিক মাঝখানে। যে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে, একটা লাল সবুজ পতাকা পেতে একদিন জীবনের পরোয়া করেননি, সেই জীবন অবসানের দিনে লাল-সবুজ পতাকাটাই ঢেকে রাখল আব্বুকে। আব্বু চলে গেলেন, সুপরামর্শ দেবার সবচেয়ে কাছের মানুষটা ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে, তার পরেও এই দৃশ্য অন্যরকম একটা শান্তি দিয়েছিল। আর আমি যতবার এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হই, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। যাঁরা পতাকা অর্জনের মূলে ছিলেন, তাঁদেরই তো প্রাপ্য এমন সম্মান।

হেলাল হাফিজ বলেছিলেন, 'কথা ছিল একটি পতাকা পেলে আমি আর লিখব না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা।' 'কথা ছিল একটি পতাকা পেলে আমাদের সব দুঃখ জমা দেব যৌথ খামারে।' আজও হয়নি আমাদের যৌথ খামার, ভূমিহীন মনুমিয়া জ্যৈষ্ঠে-বোশেখে তৃপ্তির গান গায় না, যুদ্ধ শিশু সসম্মানে সাদা দুধে-ভাতেও বাঁচে না। সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ সকলেই নিয়ে যেতে পারি না নিজের সংসারে। পাতা কুড়ানো মেয়েটিও এখনও শীতের সকালে ওম নিতে পারে না জাতীয় সংগীত শুনে পাতার মর্মরে। তবু বলি, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার শক্তি দাও।'

জাকিয়া খান
(শিক্ষক ও লেখক)

লাল সবুজের পতাকা; আমার আবেগ, আগ্রহ এবং অন্যান্য গল্প

সিফাত রহমান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান কবি অ্যালেন গিন্সবার্গকে এক সাক্ষাৎকারে আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন প্রশ্ন করেন, "আপনি কি সমর্থন করেন পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্র থাকবে না এবং রাষ্ট্রপ্রধানও স্বাভাবিকভাবে থাকবে না?" উত্তরে তিনি বলেন, "আমি চিন্তাবিদ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নই, তবু আমার মনে হয় রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ ভালোভাবেই চলতে পারবে। কিছু নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে নতুনভাবে।" গিন্সবার্গের এই চিন্তা আমার মাথায়ও বার কয়েক এসেছে। মাঝে মাঝে সমর্থনও করেছি হয়তো। কিন্তু এই আমিই আবার আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনের গল্পগুলো নিয়ে বিশেষ আগ্রহ রাখি।

তখন সবে প্রথম বর্ষে পড়ি। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় পড়েছি, ২ মার্চ, ১৯৭১ কলাভবনের সামনে আ স ম আব্দুর রব প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। কলাভবনের সামনের সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে নিজেকে কল্পনা করেছি একবার। আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম কিংবা তৎকালীন সময়ের একজন ছাত্র হতাম, আমি কি এই সাহসটা করতে পারতাম?

আবার যেমন জহুরুল হক হলের ১১৬ নম্বর রুমে ৭০ সালের ৬ জুন তারিখে পতাকা তৈরির যে পরিকল্পনা করা হয় তার প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে বারে বারে ভাবিয়েছে। নকশাটাই বা এলো কোত্থেকে? একজনের প্রচেষ্টা না একটি যৌথ উদ্যোগের ফসল?

ছাত্রদের হাত দিয়েই কেন? রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই বা কি ছিল? এমন হরেক রকমের চিন্তা করতে করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি সুযোগ এলে আমাদের জাতীয় পতাকার জন্ম নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করব।

সেই সুযোগ এলো তৃতীয় বর্ষে। কাজ শুরু করে দিলাম। আমি, সাব্বির, শিশির, স্তেভান। শুরুতে পড়াশোনার ধাপ। জানলাম নতুন নতুন অনেক নাম, অনেক আলোচনা, সমালোচনা, কত শত গল্প। কিন্তু সব থেকে ঝামেলার যেই বিষয়টি আমাদের সামনে এসেছে তা হলো এই নিয়ে সে সময় কোনো লিখিত বই আমরা পাইনি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, পত্রিকা ঘেঁটে জানার চেষ্টা করেছি। আরেকটি সমস্যা ছিল পতাকার জন্মের সঙ্গে জড়িত যেসব ব্যক্তি, তাঁদের অনেকেই আমাদের মাঝে আজ আর নেই।

কাজটা এখনো চলমান আছে। শেষ করতে পারিনি। মাঝে যে পরিকল্পনায় আগাচ্ছিলাম তা থামিয়ে দিতে হলো কারণ দেখলাম আমাদের আগে এমন একটা কাজ করা হয়েছে। এরপর খুঁটিয়ে বের করলাম কাজ করা হয়নি জায়গাটা।

সেদিকে আগালাম পুনরায়। তারপর এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান আছে। আমাদের শ্যুটে একটি মজার ঘটনা ঘটে। কাকতালীয়ভাবে আমরা যেদিন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে শ্যুট করছি, তারিখটি ছিল ৬ জুন, ২০২৪। বাস্তবে যেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল তার তারিখ ছিল ৬ জুন, ১৯৭০!

সিনেপ্লেক্সে সিনেমা শুরু হবার আগে, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যখন নিজ দেশের জাতীয় সঙ্গীত শুনি, জাতীয় পতাকা দেখতে পাই একটা অন্যরকম অনুভূতি তৈরি হয় আমার। তাকে কী নাম দেব? আবেগ?

সিফাত রহমান
(শিক্ষার্থী, টেলিভিশন চলচ্চিত্র ফটোগ্রাফি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

বাংলাদেশের পতাকার জন্ম কথা

হাসানুল হক ইনু

১৯৭০ সালের ৭ জুনকে কেন্দ্র করে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ একটা ভিন্নধর্মী কর্মসূচির কথা ভাবলেন কেন? তারা ভাবলেন এমন একটা কিছু করা যা বাংলাদেশের সংগ্রামরত জনগণকে পরিষ্কারভাবে সামরিক প্রস্তুতির দিকে উজ্জীবিত করে। এই ভাবনাটা দানা বাঁধতে থাকে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা জাতির সামনে পেশ করার পর থেকে। ১৯৬৬ সাল হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ধারায় এক বিরাট মোড় বদলকারী রাজনৈতিক ঘটনা। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক নতুন মাত্রার যোগ হয়। অপরদিকে, এ দেশের জনগণের চিন্তাধারায় এক নীরব বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এরপর এমন সব রাজনৈতিক ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় পাকিস্তানের আইয়ূব খানের সরকার, যা তৎকালীন চলমান রাজনীতি উত্তপ্ত করে তুলতে থাকে এবং সাংঘর্ষিক অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা, তারপরই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং তাপর ছাত্রদের ৬ দফা সম্বলিত ১১ দফার ভিত্তিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং আইয়ূব খানের পতন– এসবই রাজনীতিতে নতুন আবহাওয়া তৈরি করে। যার বিশেষণ দরকার। তবেই কেবল আমরা বুঝতে পারব কেন 'জয়বাংলা বাহিনী' গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। এজন্যই খুব সংক্ষেপে ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

১৯৬৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা রক্ষার কোনো প্রস্তুতিও পাকিস্তান সরকারের ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলা অরক্ষিত ছিল। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলসমূহের

এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের তরফ থেকে পাকিস্তানে প্রদেশে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা উত্থাপন করেন।

১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পূর্ব বাংলা নিয়ে চক্রান্ত, দমন-পীড়নের ধারা শুরু করে। তারপর থেকেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গণে পাকিস্তানের ভেতরই পূর্ব বাংলার স্বশাসনের দাবিটা উঠতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচনের হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত ফ্রন্ট ২১ দফা দাবির ভেতরেও ১৯নং দফাতে বলা হয়, 'ঐতিহাসিক লাহোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রা ব্যবস্থা ছাড়া অন্যসব বিষয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। ...'

২১ দফার মধ্যে স্বাধিকার বা স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসনের কথা মোটাদাগে উচ্চারিত হলেও যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় আসলেও তা জনমনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান অন্যায় করছে, ঠকাচ্ছে, শোষণ করছে এবং জোর করে দখলে রাখতে চাচ্ছে– তা পরিষ্কার হলেও স্বায়ত্তশাসনের রূপটা কী হবে, কীভাবে তা কার্যকর হবে তা বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাতেই পরিষ্কার ফুটে উঠে। পাকিস্তানের কেন্দ্রে একটি ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, যার হাতে কেবল থাকবে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়, আর বাকি যেমন : পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা মুদ্রা ব্যবস্থা, প্রদেশগুলোতে রাজস্ব ধার্য আদায়ের ক্ষমতা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার ক্ষমতা এবং মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা থাকবে। ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরই পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালনার একটা ছবি ফুটে ৬ দফায়। যা ছিল ভাসা ভাসা, তা ৬ দফাতে হয়ে উঠল জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত। যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল এবং স্বায়ত্তশাসন বোধগম্য হলো। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান ৬ দফাকে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোবিরোধী একটা ছক হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং প্রকাশ্যেই বলেও ফেললেন। [আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ রাজশাহীতে অর্থাৎ প্রায় ৩৯ দিন পর ভাষণে বলেন, "ইহা (অর্থাৎ ৬ দফা) বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা। (শেখ সেলিম, পৃষ্ঠা-৩৫৫ম বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ)]

না বঙ্গবন্ধু, না অন্য কেউ ৬ দফার ওপর কথা বলার সময় তখন পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে বলেননি। আইয়ুব খানই ৬ দফাকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পরিকল্পনা হিসাবে বলে। এতে ৬ দফার সঙ্গে যে স্বাধীনতার একটা সম্পর্ক আছে, তা জনসম্মুখে চলে আসে। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথাটা প্রকাশ্যেই আলোচনার বিষয়ে পরিণত করে ফেলে পাকিস্তানিরা। কৌশলগতভাবে যতই ৬ দফাকে তখন পাকিস্তানের ভেতরেই বাঙালির মর্যাদাপূর্ণ একটা রাজনৈতিক স্বাশাসনের প্রস্তাব বলার চেষ্টা করা হচ্ছিল কেন, পাকিস্তানিরা বরং তা নাকচ করে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ৬ দফা দিয়ে পাকিস্তান ভাঙার নেতা হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। বাংলার জনগণের কাছে পাকিস্তানিরাই '৬ দফা'কে স্বাধীনতার পূর্ব প্রস্তাব হিসেবে প্রচার করে 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত করে দেয়।

৬ দফার একটা রাজনৈতিক দিক আছে, আছে আলাদা একটা অর্থনৈতিক দিক এবং কিছুটা হলেও আছে সামরিক দিক। ফলে ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন হলে তা বাস্তবে কার্যত একটি আলাদা স্বনির্ভর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনারই জন্ম দিবে। ফলে ৬ দফা বাস্তবায়ন হলে পূর্ব বাংলায় আলাদা একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা হবে, আলাদা একটা বাহিনী হবে। সুতরাং ৬ দফার পক্ষে যারা দৃঢ় অবস্থান নিচ্ছে, তাদের মননে একটা সামরিক দিক অর্থাৎ সামরিক প্রস্তুতির দিকটাও চলে আসতে থাকে। তাই ৬ দফা হচ্ছে পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে রক্ষার প্রস্তাব। ৬ দফা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে বাঙালির মুক্তির সনদ। 'স্বাধীনতা' শব্দটি ৬ দফার পিঠে চড়ে বাঙালির মানসে ভেসে উঠতে শুরু করে। বাঙালির মানসে স্বাধীনতার বীজটা বপন করে দেয়। স্বশাসন আর স্বাধীনতা, এই দুই বিষয়ে নড়াচড়া শুরু হয়। আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে ৬ দফা কার্যত হয়ে পড়ে '৬ দফার মোড়কে স্বাধীনতার প্রস্তাব'। পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সাংবিধানিক কাঠামোতে কি ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব?- উত্তর না। তাই ৬ দফার পর আওয়াজ উঠে আইয়ুব খানের সংবিধান বাতিল করার এবং নতুন সংবিধান তৈরি করার। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে এক ইউনিট রাখলে কি ৬ দফা বাস্তবায়ন সম্ভব? উত্তর, না। তাই 'এক ইউনিট' বাতিল করে পাকিস্তানে

পূর্ব বাংলার মতো পাঞ্জাব, সিন্দু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলো প্রদেশ হবে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংসদের আসন বণ্টন হবে। তাই ৬ দফা বাস্তবায়ন করতে হলে পাকিস্তানে গণপরিষদ গঠনের জন্য নতুন নির্বাচন করতে হবে।

চয় দফাকে যখন বলে পাকিস্তান ভাঙার প্রস্তাব, তখন পূর্ব বাংলায় আরেকটা আলোচনার সূত্রপাত হয় পাকিস্তানিদের ৬ দফা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্য। তা হলে ৬ দফা না মানলে, কী হবে? দমনের পথ নিলে কী হবে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটাই কথা চলে আসে ৬ দফা না মানলে এক দফা, অর্থাৎ স্বাধীনতা। না মানলে স্বাধীনতা ছাড়া উপায় নেই। কারণ বাঙালির মর্যাদা রক্ষা করতে হলে স্বায়ত্তশাসন দরকারই, তা না হলে পাকিস্তানের গোলামে পরিণত হওয়া। পূর্ব বাংলার জনগণ হয়ে পড়বে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানসম্মান সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং স্বায়ত্তশাসন না মানলে তা অর্জন করতে হলে শেষমেষ স্বাধীনতাই সমাধান। ৬ দফা না হলে কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা চলতে থাকে এবং পরে একদিন ঘরোয়া বৈঠকে বলেই দেন বঙ্গবন্ধু, '৬ দফা ওপারে যাওয়ার সাঁকো'।

এখন ৬ দফা আদায়ের পথে এগুনো প্রথম কর্তব্য এবং সেই পথেই আদায় না হলে এক দফার বিষয়ে এগুনো। এই ধারণাটা সামনে নিয়ে এগুনোর প্রথম কাজ হয় ৬ দফাকে জনগণের ৬ দফাতে রূপান্তর করা, দ্বিতীয় কাজ আইয়ূব খানের সংবিধান বাতিল ও নতুন গণপরিষদের নির্বাচন আদায় করে আনা। এক ইউনিট প্রথাও বাতিল করা। এসব লক্ষ্য একটার পর একটা ধাপে ধাপে সামনে চলে আসে এবং একই সঙ্গে ৬ দফা না হলে, কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে তার ভাবনাটাও সামনে চলে আসে। তাই সেই ভাবনার জন্য 'তিন নেতার স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' পরিকল্পনায় হাত দেয়। প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজগুলোর জন্য বলিষ্ঠতা প্রদর্শন ও সামন্তরালভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি শুরু করার তাগিদ তাঁদের মাঝে দেখা দেয়। সুতরাং ৬ দফার প্রস্তাব মাঠে আসার পর সে বাস্তবতার চিত্র ফুটে ওঠে। তাই 'স্বাধীনতা' ও সামরিক প্রস্তুতির একটা তাগিদ দিতে থাকে, স্বাধীনতাপন্থি ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের। বঙ্গবন্ধুও তা বুঝতেন, তাই ৬ দফা দিয়েই তিনি পূর্ব

বাংলায় ঝটিকা প্রচার সফরে বের হয়ে পড়েন। পাকিস্তানিরা শুরুতেই '৬ দফা'কে স্তব্ধ করে দিতে শিথিলতা দেখায়নি। কয়েকদিনের ভেতরেই গ্রেপ্তার-দমন-পীড়নের পথেই আইয়ূব খান এগোতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন। কোর্ট থেকে মুক্ত হন, আবার গ্রেফতার হন। সারা দেশে বঙ্গবন্ধু সফর করছেন, ভাষণ দিচ্ছেন, গ্রেপ্তার হচ্ছেন, আবার সফর ও ভাষণ। এর একপর্যায় ৭ জুন ১৯৬৬ সালে ৬ দফার জন্য হরতাল আহ্বান করে আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে বন্দি। জনগণ আশাতীতভাবে হরতালের পক্ষ নেয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ চরম দমন-পীড়নের পথ নেয়। শ্রমিক নেতা মনু মিয়াসহ অনেক হতাহত হয়। ঢাকাসহ পূর্ব বাংলা ৭ জুন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। ৬ দফা ৭ জুন আন্দোলনকারী শহীদদের রক্তে লাল হয়ে ফুটে উঠল পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে। ৭ জুন ১৯৬৬-তে ৬ দফা বনাম পাকিস্তান হয়ে পড়ল। সেই থেকে ৭ জুন হলো ৬ দফা দিবস।

৭ জুন ৬ দফা দিবসে শিক্ষা ছিল, ৬ দফা পাকিস্তানিরা মানবে না। লড়াই করেই বাঙালিদের আদায় করে নিতে হবে। আর সে লড়াই সম্ভবত হয়ে পড়বে নরম-গরম লড়াই। কারণ পাকিস্তানিরা ৭ জুন অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেছিল। তাই ৭ জুন ৬ দফা আদায়ের বিষয়টির সঙ্গে একটি সামরিক দিকেরও ইঙ্গিত দেয়।

শুধু তাই নয়, ৬ দফাকে স্তব্ধ করতে বঙ্গবন্ধুকে জানে মারার পরিকল্পনার পথেই চলতে শুরু করল। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারিতে ঢাকা কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুকে নতুনভাবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ দফা দেওয়ার পর প্রায় এক বছর ১১ মাস পর 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামিগণ'— এই শিরোনামে এক নতুন মামলা চালু করা হয়। ওই মামলায় বলা হয়, 'আসামীরা ভারতের সহায়তায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল'। এই মামলাকেই প্রচার মাধ্যম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করতে শুরু করে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই ১৯ জুন ১৯৬৮ সালে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়, অবশ্য প্রকাশ্যেই এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে।

৬ দফার পরে পাকিস্তানিদের বিরোধিতা এবং তারপর 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এটিই প্রমাণ করে যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ৬ দফাকে মানবেই না। বাঙালিদের ও তাদের নেতাদের জানে মেরে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। আগরতলা মামলার অভিযোগেই বলা হয় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে চান। তাই ৬ দফার পর আবার পাকিস্তানিরাই বাঙালিদের সামনে 'পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার' বিষয়টি ছুড়ে দিল। যারা স্বাধীনতার কথা ভাবত না, তারাও স্বাধীনতা শব্দটা নিয়ে নড়াচড়া শুরু করল। পছন্দ হোক আর না হোক, যাদের কাছে পাকিস্তান ছিল 'সাধের পাকিস্তান', তাদেরও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার চিন্তাটা দোলা দিয়ে যেতে লাগল। পূর্ব বাংলাকে কি স্বাধীন করা যাবে? অস্ত্র নাই, গরিব মানুষ, বিদেশি সহযোগিতা নাই। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ভালোভাবেই শুরু হলো। আগরতলা মামলা আসার পর ছাত্রলীগের ভেতর আপসহীন মনোভাবটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে শুরু করল। পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর থাকা সম্ভব না, এই ধারণাটাই দানা বাঁধতে শুরু করল। সেই সময়েই ছাত্রলীগের মধ্যে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, শেখ মুজিবকে মুক্ত করো'– এ ধরনের স্লোগানগুলো জোরালো হতে শুরু করল। যুবসমাজ মানসিকভাবে সশস্ত্র হওয়ার তাগিদ অনুভব করতে শুরু করল।

এরপরের ইতিহাস সবার জানা। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি আসাদ হত্যা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। ছাত্র আন্দোলন পরিণত হয় ছাত্র-জনতার অন্দোলনে– গণঅভ্যুত্থানে। আইয়ূবের পরাজয় ঘটে। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু দুপুরে মুক্ত হয়ে তার ধানমন্ডির ৩২নং বাসভবনে চলে আসেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে জনাব তোফায়েল আহমেদ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ূব খান বিদায় হয়। তার বিদায়ী ভাষণেও ৬ দফা ও এক ইউনিট নিয়ে তীব্র আপত্তিকর কথা বলে

পাকিস্তানিদের সতর্ক করে দেন। আইয়ূব বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও ৬ দফা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো পাকিস্তানকে দুর্বল করবে।'

এসব নতুন নতুন মাত্রা নতুন নতুন কর্তব্য নির্ধারণ করতে তাগিদ দেয়। সে প্রসঙ্গে আলোচনার আগে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালিদের জন্য এবং ৬ দফা আদায়ের জন্য আরো কিছু বিজয় ছিনিয়ে আনে। যেমন ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই, 'নতুন সংবিধান রচনার জন্য নতুন গণপরিষদ গঠন ও তার নির্বাচনের ঘোষণা দেন'। 'পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ (ভঙ্গকরণ) নামে অধ্যাদেশ' জারি করে এক ইউনিট বাতিল করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চার প্রদেশের সৃষ্টি করেন। আর তা হলো, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এক মাথা এক ভোটের হিসাবে গণপরিষদের ৩০০ আসনের ১৬২টি পূর্ব বাংলার জন্য ও নারীদের সংরক্ষিত ১৩ আসনের মধ্যে ৭টি– এই মোট ১৬৯ আসন হয়। আর সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশ মিলিয়ে তারা পায় ১৪৪ আসন। সুতরাং এই ঘোষণা বাঙালিদের জন্য একটা ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে গেল নির্বাচন হবে কি না এবং হলে যদি বাঙালিরা বিজয়ী হয়, ক্ষমতায় বসতে পারবে কি না। তাই জটিল অবস্থা, একদিকে অনিশ্চয়তা অরেকদিকে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায় এ নির্বাচন মোকাবিলার পাশাপাশি ৬ দফা না হলে এক দফার প্রস্তুতি সামন্তরালভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল।

নির্বাচনও করতে হবে, ৬ দফা না হলে এক দফায় জনমানুষকে রাজি করাতে হবে, স্বাধীন বাংলার ছবিটাও ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং একই সঙ্গে সশস্ত্র প্রস্তুতির বিষয়টিও এগিয়ে নিতে হবে। নির্বাচনি আন্দোলন, গণমানুষের আন্দোলন ও সশস্ত্র আন্দোলন– এ তিনের একটা কুশলী ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল।

এরকম পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কি ভূমিকা রাখলেন এবং সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ কীভাবে কাজ করল তাও আমরা দেখেছি পরবর্তী কার্যক্রমের মধ্যে। বঙ্গবন্ধু ও 'তিন নেতার কোষ' এর

পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম ছিল, সমন্বয় কী রকম ছিল তাও আমরা দেখব পরবর্তী কাজের ধারায়।

পাকিস্তানের গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ১৯৭০ এর ৭ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পথটি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় একই সঙ্গে সেটাও করা হয়। ১৯৬৯-এর ছাত্র গণঅভ্যুত্থান যে উত্তাপ ছড়ায় তা ধরে রাখা এবং তার পাশাপাশি ৬ দফার পক্ষে নির্বাচনটা কাজে লাগানো, না হলে কী হবে তারও মীমাংসা জনমনে গেঁথে দেওয়াটাও জরুরি হয়ে পড়ে।

১৯৬৯-এর ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে আফতাব আহমেদের 'জয় বাংলা' ধ্বনি উচ্চারণ এবং পরবর্তীতে ছাত্রযুবদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হওয়া জাতিত্ববোধের স্ফূরণও ঘটায় এবং বাঙালির লড়াইয়ের রণধ্বনিও হয়। নির্বাচনের আগে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দেওয়া নিয়ে তুমুল বিতর্ক হলেও ১৯৭০ এর ১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে জনসভার মঞ্চ থেকে সিরাজুল আলম খান বঙ্গবন্ধুর সামনেই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দেন। মঞ্চের মাথায় লাল অক্ষরে লেখা 'জয়বাংলা' হার্ডবোর্ডে টাঙানোও ছিল। এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন এবং প্রকাশ্য জনসভায় অনানুষ্ঠানিক অনুমোদনও হয় এবং 'জয়বাংলা' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'জয়বাংলা' ধ্বনি তারপর জনগণের গর্ব প্রকাশের সাহস প্রদর্শনের এবং বাঙালিদের প্রকাশের সবচাইতে কার্যকরী প্রেরণা হয়। গণপরিষদ নির্বাচন ও যুদ্ধ জিততে এই ধ্বনি মন্ত্র ধ্বনি হিসেবে কাজ করে। মাঠ পর্যায়ের একজন আফতাবের জয়বাংলা উদ্ভাবন এর ঘটনা ও ছাত্রলীগের ও বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্তি চলমান রাজনীতিতে অপূর্ব সমন্বয়েরই প্রকাশ ঘটায়।

১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন, যেগুলো বাংলাদেশকে আরো ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ হইতে দ্বিতীয় রাজধানী, 'আইয়ুব নগর' ও 'রেসকোর্সের' নাম যথাক্রমে 'শেরে বাংলা নগর' ও 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান' হইবে।" এও বলেন, 'বাংলাদেশ বাংলার মাটির সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং 'বাংলাদেশ' নাম পরিবর্তন করার অধিকার আর কাহারো নাই।"

পাকিস্তানের চিহ্নগুলো মুছে ফেলার এসব ঘোষণা এটাই প্রমাণ করে যে ৬ দফা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, এসব নিয়ে কোনোরকম দরকষাকষি চলবে না। সুতরাং আপসহীন বঙ্গবন্ধু ৬ দফা না হলে যেন বাংলাদেশ হয়, তার জন্য দৃঢ় অবস্থানটা ফুটিয়ে তোলার জন্যই নির্বাচনি প্রচারণার প্রস্তুতির ভেতরই বাংলাদেশের ছবিটা একটু একটু করে ফুটিয়ে তোলার কাজ করেছেন এবং বিপ্লবী পরিষদকে করতে দিয়েছেন ও সমর্থনও দিয়েছেন।

এ বক্তব্য প্রদানের আগেই পূর্ব বাংলার নামকরণ 'বাংলাদেশ' বঙ্গবন্ধু করেন ১৯৬৯ এর ৫ ডিসেম্বরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে তার সমাধিস্থলে। স্মরণ সভার ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হবে 'বাংলাদেশ'।"

১৯৬৯-এর ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর লন্ডন যাত্রাও তাৎপর্যপূর্ণ, আন্তর্জাতিক মিত্র খোঁজার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস ছিল তা। স্বায়ত্তশাসন না হলে স্বাধীনতা, তা হলে যুদ্ধ, বৈদেশিক মিত্র, সশস্ত্র সরঞ্জামের সহযোগিতা– এসবই পর্দার আড়ালে বঙ্গবন্ধু সেরে ফেলেন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে কথাবার্তায় তা প্রকাশ পায়। তাই দেশের ভেতরেও সামরিক প্রস্তুতির বিষয়টাও সিদ্ধান্তে চলে আসে। এ সবই তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর বহুমাত্রিক রাজনৈতিক কৌশল চর্চারই মুন্সিয়ানার প্রকাশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সবচাইতে আদর্শিক শত্রু হলো জামাতে ইসলামী দল এবং তাদের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার দর্শন। শত্রুর আদর্শকে পরাজিত করতে হয় এবং শারীরিকভাবেও দমন করতে হয়। সামনে নির্বাচন নিয়ে লড়াই, সে লড়াইয়ে ৬ দফা বনাম পাকিস্তানের লড়াইটা সাজানোর জন্য জামাতকে লড়াই এর মাঠ থেকে হটিয়ে দেওয়া খুবই জরুরি ছিল। আমরা দেখি তরুণ তিন নেতা সে প্রশ্নে সজাগই ছিলেন। মাঠের রাজনীতিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ধারায় সীমিত বলপ্রয়োগের কৌশল প্রয়োগ ঘটে ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে পল্টনে জামাতের জনসভায়। সভা পণ্ড হয়ে যায় জনতার প্রতিরোধের মুখে। অনেক হতাহত হয়। এরপর আর জামাত পূর্ব বাংলায় দাঁড়াতে পারেনি। এটাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর আমরা দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ ডাকসু নির্বাচনে ১৭ মে ১৯৭০ সালে ডাকসুতে ছাত্রলীগের মহাবিজয়ের ঘটনা। ছাত্রলীগ ডাকসুতে ছাত্র সমাজের বৈধ নির্বাচিত নেতৃত্ব। দেশের অন্যান্য ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দেখি ১৯৭০ সালের মে পর্যন্ত ১৪২ কলেজের মধ্যে ১৩২টি কলেজে ছাত্রলীগ বিজয়ী হয়েছে। পরবর্তী আন্দোলন পরিচালনায় ছাত্রদের নির্বাচিত বৈধ প্রতিনিধির যথেষ্ট প্রস্তুতি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

এ রকম ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই চলে আসে ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। 'বিপ্লবী পরিষদের' তিন নেতা স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিকাশমান গণচেতনার প্রেক্ষাপটে এবং ৬ দফার সামরিক দিক বিবেচনায় রেখে এবং অবশ্যই ৬ দফা না হলে এক দফার কথা ভাবনায় রেখে সামরিক প্রস্তুতির বিষয়টা গুরুত্ব দেন। গোপনে নয় এমনভাবে করতে হবে যাতে জনগণ সাময়িক বিষয়টা বিবেচনায় নিতে পারেন এবং সে অনুযায়ী মানসিক ধাঁচ গড়ে তুলতে পারেন। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সামরিক কায়দায় প্রকাশ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সালে ঢাকায় প্যারেড হবে। ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি মফিজুর রহমান খানকে কমান্ডার এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনুকে উপ-কমান্ডার করে 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী'র প্যারেড হলো। শেখ হাসিনাও এই প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। এই প্যারেড সামরিক প্রস্তুতি প্রদর্শনের প্রথম প্রচেষ্টা। এই প্যারেডে 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী'র পতাকা তৈরির কথা থাকলেও তা পরে করা হয়নি। এসবই কিন্তু ১৯৭০ এর ডিসেম্বরের নির্বাচন সামনে রেখে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সবই দেখছে, কিন্তু কোনো কিছুই করতে পারেনি।

৬ দফা প্রদান, আগরতলা মামলা, ১৯৬৯ ছাত্রগণঅভ্যুত্থান, জামাতের সভা পণ্ড, জয় বাংলা স্লোগানের অভিষেক, 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনি'র প্যারেড, 'বাংলাদেশ' নামকরণ- এসবই বার বার বলে দেয় স্বায়ত্ত্বশাসন আর স্বাধীনতা হচ্ছে একই হাতের এপিঠ-ওপিঠ। এরকম একটা প্রেক্ষাপটে ৭ জুন ১৯৭০-এ আন্দোলনকারীদের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিপ্লবী পরিষদের তিন নেতা সামরিক দিক ফুটিয়ে তোলার পক্ষে

সিদ্ধান্ত নেন। 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী'র ধারাবাহিকতায় আরো সর্বব্যাপক অর্থবহনকারী 'জয় বাংলা' কাজে লাগিয়ে 'জয় বাংলা বাহিনী' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটেলিয়ন পতাকার দরকার। তবে সে পতাকা যেন ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়, তেমন করে গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের পতাকা কখন কীভাবে হলো, কারা সিদ্ধান্ত নিল সে সম্পর্কে যাঁরা পতাকার জন্ম কাহিনির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের অনেকে আর পৃথিবীতে নেই, অনেকে আছেন বেঁচে এখনও। তার মধ্য থেকে কেউ মুখে বলেছেন, কেউ বা লিখেছেন।

পতাকা নিয়ে যাঁরা বলেছেন বা লিখেছেন, যাঁদেরটা আমার জানার সুযোগ হয়েছে, তারা হলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শেখ শহিদুল ইসলাম, কামরুল আলম খান খসরু, বুয়েটের ইউসূফ সালাহউদ্দীন, প্রকৌশলী খাবিরুজ্জামান, লিটিল কমরেড রফিকুল ইসলাম, রায়হান ফেরদৌস মধু এবং শিবনারায়ণ দাশ প্রমুখ। এর বাইরেও চট্টগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষক ডাক্তার মাহফুজুর রহমানের বিভিন্ন লেখাও রয়েছে।

দীর্ঘদিন পরে স্মৃতি থেকে দেখা বেশ দুরূহ কাজ। কিছু বিষয় অনুল্লেখ রয়েছে অনেকের লেখায়। কিছু বিষয়ের বিবরণ আরেকজনের বিবরণের সঙ্গে মিলে না। তবে যাঁরা পতাকা নিয়ে বলেছেন, লিখেছেন, তারা সবাই পতাকার জন্ম কাহিনির সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন। আমার অবস্থানটা হলো আমি পতাকার জন্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষীমাত্র। পতাকা জন্মকাহিনি বলতে হলে প্রথমেই বলতে হবে পতাকা নির্মাণের সিদ্ধান্ত কারা নিলেন? সিদ্ধান্তের পর পতাকা তৈরির দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হলো? পতাকার খসড়া নমুনা আঁকা হলো কীভাবে? পতাকা নির্মাণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় হলো কিভাবে? পতাকা তৈরির পর ওই রাতে কি তা বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয়? কীভাবে ৭ তারিখে পতাকা পল্টন ময়দানে গেল? পল্টনে পতাকা কীভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতে প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হয়। কুচকাওয়াজের পতাকা কোথায় রক্ষিত হয়, কার

হেফাজতে? ১৯৭১-এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আ স ম আবদুর রবের হাতে পতাকা কীভাবে গেল? এসব প্রশ্ন বা এ সংক্রান্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে পতাকার জন্ম কাহিনি দাঁড়িয়ে যায়।

স্মৃতি থেকে লেখা, তাই তথ্যের বিভ্রাট বা ক্রুটি হয়ে যেতে পারে। তবে একজন মাঠকর্মী হিসেবে যা বুঝেছি, যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই তুলে ধরব।

প্রথমে বলা দরকার সেই পতাকা বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে নির্মাণ করা হয়নি। এই পতাকার জন্ম হয় ১৯৭০ এ ৭ জুন, ৬ দফা দিবস উত্থাপনকে কেন্দ্র করে 'জয় বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজের ব্যাটালিয়ন পতাকা হিসেবে। কীভাবে তা বাংলাদেশের পতাকা হলো তা সবার জানা দরকার।

আগেই বহুবার বলেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মাঠের আন্দোলনে এমন সব মোড় বদলকারী ঘটনা ঘটেছে, যা আনুষ্ঠানিকতার বাইরে ঘটেছে। কিন্তু সেসব ঘটনা স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতিপর্বে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জনগণকে সশস্ত্র প্রস্তুতির মানসিক দৃঢ়তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এই প্রস্তুতির কাজ কখনো প্রকাশ্যে, কখনো অপ্রকাশ্যে এবং এসব কিছুর সঙ্গে কেবল বঙ্গবন্ধুরই যোগসূত্র ছিল, যা ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণে দেখা যায়।

এই প্রস্তুতিপর্বে অনেক কিছুর মতোই আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় কমিটিগুলোতে সশস্ত্র প্রস্তুতি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি, সিদ্ধান্তও হয়নি এবং তা হওয়া সম্ভবপরও ছিল না। কিন্তু কাজগুলো যেভাবে সুশৃঙ্খলভাবে একটার পর একটা হয়ে যাচ্ছিল, তার জন্য নেতৃত্ব দরকার; দরকার আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও অংশগ্রহণ। এমনকি সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তা ও অংশগ্রহণও জরুরি ছিল। এখানেই মাঠের কাজ, ঘটনা ও বঙ্গবন্ধুর সমর্থন ও অংশগ্রহণ এর মাঝখানে অপ্রকাশ্যে ভূমিকা রাখছিল। সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ– এই তিনজনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি আপসহীন স্বাধীনতাপন্থি কেন্দ্র, যাকে পরে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ', আরো পরে 'নিউক্লিয়াস' বলা

হয়েছে। 'নিউক্লিয়াস'ই স্বাধীন বাংলাদেশের ঘটনাচক্রে ভবিষ্যৎ পতাকা নির্মাণের সিদ্ধান্তদাতা ও পরিকল্পনাকারী।

সেই ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ নির্মাণের নেতৃত্ব দেন কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনি, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের নিচতলায় ১১৬নং কক্ষে ৬ জুন, ১৯৭০-এ সন্ধ্যায় ওই চার নেতা বৈঠকে বসেন। আমি (হাসানুল হক ইনু), শিবনারায়ণ দাশ, বুয়েটের ইউসুফ সালাহউদ্দীনসহ আরো অনেক মাঠকর্মী তার সাক্ষী। আমরা সাক্ষী হলাম এজন্য যে, পরের দিনের 'জয় বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি কাজের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম।

এই ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগটা এমন হতে হবে যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটা ইঙ্গিত থাকে। এমন হতে হবে যেন তৎকালীন পাকিস্তানিদের অপপ্রচারের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। এমন হতে হবে যাতে নিকট প্রতিবেশী ভারতও যেন ভুল না বোঝে এবং বিভ্রান্ত না হয়। কারণ ভারতের পশ্চিম বাংলা তাদের একটা রাজ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি কেবলমাত্র পাকিস্তানের পূর্ব বাংলাকে নিয়ে, আর কাউকে নিয়ে নয়– তা পরিষ্কার করা দরকার ছিল। সেই সময় 'ইউনাইটেড স্টেটস্ অব বেঙ্গল' নামে একটা গুজব বা প্রচার বাজারে ছিল। পাকিস্তানিরা ও বাঙালিদের যেকোনো অধিকার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ভারতের চর-দালাল-এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালাতো। বাংলাদেশের মানুষর স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য এবং জনমনে বঙ্গবন্ধু ও তার দল ও কর্মী-নেতাদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত তৈরি করার জন্য বহুমুখী বাজে অপপ্রচার চালাতো। সেই ১৯৪৮ থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বলা শুরু করে যে, পূর্ব বাংলার শাসনপন্থি নেতারা ভালো মুসলমান না, কাফের ও ভারতের চর। পূর্ব বাংলার নেতাদের হাতে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তানও বিপন্ন। তাই তাদের দমন করতে হবে এমন ধারণা প্রচারের মাধ্যমেই পাকিস্তানের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দমন-পীড়ন শুরু হয়। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা ধর্মপ্রাণ এবং হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষরাও ধর্মপ্রাণ। কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠি সাম্প্রদায়িক নয় এবং সবাই সম্ভাবের সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে বসবাস করছে বছরের পর বছর ধরে।

'নিউক্লিয়াসে'র নেতারা যেমন পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারছিলেন, তেমনি 'জয় বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজে পল্টনে বঙ্গবন্ধুর অভিবাদন গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটা এটাই বলে যে বঙ্গবন্ধুও তা উপলব্ধি করেন এবং তার বহুমাত্রার রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসাবে প্রকাশ্য কাজকর্ম নির্বাচনসহ সব কাজের পাশাপাশি সশস্ত্র প্রস্তুতির একটা পরিষ্কার বার্তা প্রদানের ইঙ্গিতার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। নিউক্লিয়াস ও বঙ্গবন্ধু একই ধারণায় কাজ করছেন ৭ জুনের কর্মসূচি নিয়ে। তাই নিউক্লিয়াসের নেতারা জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ যেন স্বাধীনতার ইঙ্গিত বহন করে, তেমনভাবে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। আজকে এ সিদ্ধান্তটাকে হালকাভাবে দেখতে পারেন বা বলতে পারেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, খালি হাতে একটা স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ তেমন কিছু না। কিন্তু সেই সময় ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের ভেতর এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষাপটে এবং ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কালে, এরকম সামরিক কায়দায় ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ নিয়ে কুচকাওয়াজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। বঙ্গবন্ধু ও নিউক্লিয়াস সদস্যরা সেই ঝুঁকি নেন, কারণ তারা মনে করেন ৬ দফা হচ্ছে 'ওপারে' যাওয়ার সাঁকো, ৬ দফা হচ্ছে হাতের ওপিঠ তথা স্বাধীনতা।

যতটুকু আমার জানা, তার ভিত্তিতে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৬নং কক্ষের চার নেতার বৈঠক ও তাদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিষয় তুলে ধরব। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ ও মার্শাল মনি তাঁদের লেখা বইয়ে যা বলেছেন তা থেকে যা আমার কাছে যথাযথ মনে হয়েছে আমি সেই বৈঠকের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে তুলে ধরব। অনেক বছর পার হওয়ার পর যেহেতু উনারা ওই বইগুলো বলেছেন এবং ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করে এবং যা দেখেছি এবং যা শুনেছি সেই সময়, সেদিন ১১৬নং কক্ষের কথা– তার ভিত্তিতেই সংক্ষেপে তুলে ধরছি। শাহজাহান সিরাজের প্রস্তাবে পতাকার মাঝে লাল সূর্য হয়, মার্শাল মনি ও আ স ম আবদুর রবের প্রস্তাবে পতাকার জমিন হয় বটল গ্রিন (কালচে গাঢ় সবুজ)। অপপ্রচার থেকে আন্দোলনকে রক্ষা করতে গোলাকার লাল বৃত্তের মাঝে

সরাসরি পূর্ব বাংলার মানচিত্র সোনালি রঙে আঁকার সিদ্ধান্ত দেন কাজী আরেফ আহমেদ। সোনালি রঙের কথাটা আসে বাংলার সোনালি আঁশ (পাট) ও পাকা ধানের রং থেকে। মার্শাল মনির ভাষ্যমতে এই প্রস্তাবটা দেন সিরাজুল আলম খান, যিনি ওই হলেরই তিন তলার একটি কক্ষে প্রায়ই থাকতেন। সেদিন তিনি ওই কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তাই চার নেতা পতাকা নিয়ে যে পরিকল্পনা করেন তা অবহিত করার জন্য সিরাজুল আলম খানের কাছে গেলে তিনি ওই সোনালি মানচিত্রের কথা বিবেচনার জন্য বলেন। আমার বিশ্লেষণে এটা আসে, চার নেতার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। তাই সোনালি মানচিত্রের ধারণা আগে কাজী আরেফ আহমেদ বললেন বা সিরাজুল আলম খান বললেন সেই অহেতুক বিতর্কে প্রবেশ করে লাভ হবে না। যেহেতু কাজী আরেফ আহমেদের ওপর দায়িত্ব ছিল পতাকা নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার, তাই চার নেতার প্রস্তাবটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব হিসাবে দেখে আমার ধারণা তা সিরাজুল আলম খান অনুমোদন করেন। সোনালি মানচিত্র রাখার সিদ্ধান্ত কাজী আরেফ আহমেদ এবং সিরাজুল আলম খান উভয়ের উপর বর্তায় বলে আমার ধারণা। ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগের বিষয় সিরাজুল আলম খানের ভাষ্যমতে আবদুর রাজ্জাকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে তা জানানোর। কতটুকু কী জানানো হয়েছিল তা আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ পরের দিন বঙ্গবন্ধু নিজেই সহাস্যে পতাকা গ্রহণ করেন এবং সবাইকে দুলিয়ে তা দেখান। সুতরাং পতাকা নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে কতুটুকু জানতেন বা জানতেন না– এ অহেতুক বিতর্কের দরকার নেই। পতাকা উনি গ্রহণ ও প্রদর্শন করেন। সে যা হোক, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৬নং কক্ষে কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ যৌথ সিদ্ধান্তে ৬ জুন ১৯৭০ সালের সন্ধ্যা রাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পতাকা জন্ম নিল জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ হিসেবে। এই পতাকাই পরে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার এক সভায় ঘটনাচক্রে আ স ম আবদুর রব প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাই হয়ে যায় স্বাধীন বাংলার পতাকা, যা পরের দিন ৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহারে অনুমোদিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে তা পাঠ করেন শাজাহান

সিরাজ। জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ হয়ে গেল স্বাধীন বাংলার পতাকা। এই পতাকা উড়িয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলার সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এই পতাকা হাতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন হয়। এই পতাকাই পরে মানচিত্র বাদ দিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পর বর্তমানের বটল গ্রিনের মাঝে কেবলমাত্র লাল বৃত্তের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়।

১১৬নং কক্ষে পতাকার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর সেই পতাকা নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়। পতাকার কাপড় কেনা, দর্জি ঠিক করা, পতাকার মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা, পতাকা একটা ছোট বাঁশের লাঠিতে মুড়িয়ে পল্টনে নিয়ে যাওয়া, আ স ম আবদুর রবের হাতে দেওয়া এবং সেই পতাকা সংরক্ষণ করা, এসব নিয়ে অনেকরকম কথাবার্তা আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে এবং আমার যতটুকু অংশগ্রহণ তাও বলব, অন্যরা বলছেন এ প্রসঙ্গে তাও বলব। তবে মনে রাখতে হবে, যেসব কথার শেষ কথা হচ্ছে, সেই রাতেই পতাকা তৈরি হয়ে যায়, সেই রাতেই রং তুলি দিয়ে শিবনারায়ণ দাশের মানচিত্র আঁকা হয়ে যায়। সেই রাতেই ছোট বাঁশের লাঠিতে পতাকা মোড়ানো হয় এবং পরের দিন অর্থাৎ ৭ জুন পল্টনে সকাল ৯টার মধ্যে লাঠিতে মোড়া পতাকাটি নিয়ে যাওয়া হয়।

৪২, বলাকা ভবনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল তিনতলায়। এ কার্যালয়ের পাশের রুমেই ছিল 'পাক ফ্যাশন' নামে একটা দর্জির দোকান। পতাকাটি সেলাই করেন আবদুল খালেক এবং তাকে সাহায্য করেন মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ। সেলাইয়ের কাজ শেষ করতে বেশ রাত হয়েছে। ১১৬নং কক্ষের চার নেতারা এই পতাকা তৈরির দায়িত্ব দেন মূলতঃ আমাকে, কিন্তু তারা আবার বলেছেন যে, সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় কামরুল আলম খান খসরু, স্বপন কুমার চৌধুরী, মনিরুল হক, হাসানুল হক ইনু, জগন্নাথ কলেজের শহিদ নজরুল ইসলাম, বুয়েটের ইউসূফ সালাহউদ্দীন, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, রফিকুল ইসলাম (লিটল কমরেড), চিশতী শাহ হেলালুর রহমান, বুয়েটের মইনুল ইসলাম চৌধুরী আসাদ,

গোলাম ফারুক। এ নিয়ে বিতর্ক করার দরকার নেই। কারণ লাল-সবুজ রংয়ের কাপড়ও কেনা হয়েছে। দর্জি তা সেলাইও করেছে। তবে পূর্ব বাংলার মানচিত্র তৈরি করার জন্য আমাকে বুয়েটের শেরে বাংলা হলের ৪০১নং কক্ষে (উত্তর) আসতে হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন বুয়েটের তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসূফ সালাহউদ্দীন। বাংলাদেশের মানচিত্রটা আঁকার জন্য দরকার অ্যাটলাস, যেখানে দেশের ম্যাপগুলো থাকে। তা আমার শেরে বাংলা হলের কক্ষে না থাকায় আমরা দুজন বুয়েটেরই পাশে তিতুমীর হলের ৩১২নং কক্ষের ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হকের কাছে যাই। সেদিন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। তারপরও তিনি অ্যাটলাস ও ট্রেসিং পেপার ও ম্যাপটা দিয়ে দেন। আমরা তা নিয়ে ফিরে আসি পতাকা তৈরির কাজে।

শিবনারায়ণ দাশ ঘটনাচক্রে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং জহুরুল হক হলের ১১৮নং কক্ষে অর্থাৎ যে চার নেতা ১১৬নং কক্ষে বসে পতাকার সিদ্ধান্ত নেন, সেই কক্ষেরই পাশে ছিলেন। তিনি ভালো আঁকতে পারতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর যখন কাজী আরেফ আহমেদসহ তার তিন সঙ্গী-নেতারা তাকে দেখতে পান, তখন তারাই শিবনারায়ণ দাশকে পতাকার একটা খসড়া নমুনা আঁকতে বলেন। যে কক্ষে শিবনারায়ণ দাশ অবস্থান করছিলেন, সেই কক্ষে রং তুলিসহ অনেক পোস্টারের কাগজ ছিল। ওই ঘরে বসে পোস্টার লেখা হতো। নেতাদের অনুরোধে পতাকার খসড়া নমুনাটা শিবনারায়ণ দাশ এঁকে দেন। মানচিত্র নিয়ে যে সমস্যা দেখা দেয়, তা আমি বুয়েট থেকে ম্যাপ ও ট্রেসিং পেপার এনে সমাধান করে দিই। এখানে উল্লেখ করা ভালো যে, চার নেতা সিদ্ধান্ত সন্ধ্যা রাতেই দেন, অনেক গভীর রাতে নয়। সুতরাং বলাকা ভবনের দর্জির দোকান থেকে পতাকা বানিয়ে আবার গভীর রাতে জহুরুল হক হলে আসার ব্যাপার ছিল না। সুতরাং শিবনারায়ণ দাশ হচ্ছেন পতাকার প্রথম খসড়া নমুনা পতাকার আঁকিয়ে। সিদ্ধান্ত দেন কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ। সিদ্ধান্তদাতাও তারা, পতাকার রূপকারও তারা। শিবনারায়ণ দাশ বা আমি বা অন্যরা যাঁরা ওই কক্ষের আশপাশে ঘোরাঘুরি বা উঁকিঝুঁকি মারছিলেন, তারা সবাই পতাকা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যোগানদার মাত্র।

৪০১নং কক্ষে শরীফ নুরুল আম্বিয়াও থাকতেন। পরে ৪০৪নং কক্ষে থাকতেন ছাত্রলীগের আরেক নেতা আমাদের সহপাঠী খাবিরুজ্জামান। বলাকা ভবনের দর্জির দোকান থেকে হলে পতাকা নিয়ে আসার পর আম্বিয়া ও খাবিরুজ্জামান দুজনই দেখেন। খাবিরুজ্জামান ছোট মানানসই একটা লাঠিতে পতাকা মুড়ে দিতে সাহায্য করেন। ৭ জুন ১৯৭০ সকালে পল্টনে যাওয়ার জন্য বুয়েটের জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যরা ও ছাত্রলীগের খাবিরুজ্জামানসহ অন্য নেতৃবৃন্দ কাছেই শহীদ মিনারে সমবেত হন। সেখান থেকে সরাসরি সবাই পল্টনে চলে যায়।

আমার দায়িত্ব ছিল নিরাপদে লাঠিতে মোড়ানো ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগটি যেন কেউ না দেখে বঙ্গবন্ধুর হাতে দেওয়ার আগে, সেই সতর্কতা বজায় রেখে পল্টনে যাওয়া এবং জয় বাংলা বাহিনীর অধিনায়ক আ স ম আবদুর রবের হাতে হস্তান্তর করা।

আমি যখন পল্টনে যাই, তখন তিন সারিতে জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যগণ শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছেন। কামরুল আলম খান খসরু সহ-অধিনায়ক হিসেবে অধিনায়ক রবের পিছনে দাঁড়ান এবং তারপরেই আমি ছাত্রলীগের পতাকা নিয়ে দাঁড়াই। আমার পরে কিছুটা জায়গা রেখে তিন লাইনে সারিবদ্ধভাবে সামরিক কায়দায় বাহিনী সদস্যরা দাঁড়ান। বাহিনীর সদস্যগণ সাদা প্যান্ট-শার্ট ও সাদা শাড়ি/সালোয়ার-কামিজে সজ্জিত ছিলেন। বাহিনীর একটা টুপিও তৈরি করা হয়। টুপিটা ছিল সবুজ রঙের লাল বর্ডার দেওয়া। টুপির সামনের দিকে অর্থাৎ কপালের দিকে গোল করে বসানো হলুদের মাঝে 'জয় বাংলা' লেখা, যা টুপির সঙ্গে সেফটি পিন দিয়ে আটকানো হয়। মার্শাল মনিরুল ইসলামের মতে কয়েক হাজার টুপি তৈরি করে দেন নিউ মার্কেটের ১নং গেটের পশ্চিমের দিকের এক দর্জি দোকান। ওই দোকানের মালিক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুর রহমানের ভাই হাবিবুর রহমান। (পৃ-১৩০। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র। মনিরুল ইসলাম।) এই কুচকাওয়াজে বাদন দলও ছিল।

পল্টন ময়দানের পূর্বদিকে ছোট একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চে বঙ্গবন্ধু পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জয় বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ

করেন। জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ পল্টনের দক্ষিণ দিক থেকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

জয় বাংলা বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে আ স ম আবদুর রব লাঠিতে মোড়া পতাকাটি মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। মঞ্চের কাছে গিয়ে পুরো বাহিনী দাঁড়িয়ে পড়ে। আ স ম আবদুর রব লাঠিতে মোড়া পতাকাটি কয়েক কদম গিয়ে মঞ্চের কাছে বঙ্গবন্ধুর সামনে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পতাকাটি উনার হাতে তুলে দেন। বঙ্গবন্ধু সামরিক কায়দায় পতাকাটি গ্রহণ করেন। ওই সময়ে বঙ্গবন্ধুর ঠিক পাশেই দাঁড়ানো ছিল ছাত্রলীগের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ। আরো কারা ছিলেন তা মনে নেই।

লাঠিতে মোড়া পতাকাটি উনি আস্তে আস্তে সবার চোখের সামনে উন্মুক্ত করেন। খোলা পতাকাটি উনি এদিক ওদিক কয়েকবার দোলানোর পর সবাইকে দেখানোর পর আবার আ স ম আবদুর রবের হাতে হস্তান্তর করেন। আ স ম আবদুর রব সেলুট দিয়ে বাহিনীর সামনে পতাকা নিয়ে দাঁড়ান এবং কুচকাওয়াজ করে সামনের দিকে যান।

জয় বাংলা বাহিনী ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ ৭ জুন সকালে বঙ্গবন্ধুর হাতে প্রথম পল্টনে প্রদর্শিত হলো।

জয় বাংলা বাহিনীর এই প্রদর্শিত পতাকা কোথায় গেল? অনেকরকম ভাষ্য আছে। তবে পতাকাটি আমি কুচকাওয়াজ শেষে আ স ম আবদুর রবের কাছ থেকে নিয়ে আমার হেফাজতে নিয়ে আসি শেরে বাংলা হলের ৪০১নং কক্ষে। নিরাপত্তার কথা ভেবে সহযোদ্ধা খাবিরুজ্জামানের কাছে গচ্ছিত রাখা হয় ৪০৪নং কক্ষে।

জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ হয়তো সেভাবেই থেকে যেত। কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ বাংলাদেশের পতাকা হয়ে যায় ২ মার্চ ১৯৭১ সালে। কীভাবে তা হলো? তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি।

৭ জুন ৬ দফা দিবস উদ্‌যাপনের পর সব মনোযোগ যায় ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের গণপরিষদ নির্বাচনের দিকে। নির্বাচনে বিজয় লাভ করা ও ৬ দফার পক্ষে গণরায় অর্জন করাই প্রধান কাজ হয়। সারা দেশে গণসমাবেশ অব্যাহত থাকে। মাঠে-ঘাটে, রাজপথে সব সময় জনগণের সক্রিয় উপস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। একই সঙ্গে

স্বাধীনতাপন্থি ছাত্র-যুবারা ৬ দফার প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না, এই বক্তব্য জোরদার করতে থাকে। এই প্রচারের সঙ্গে চলে আসে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ৬ দফা না মানলে কি হবে? একটাই উত্তর, স্বাধীনতা। তাই গণপ্রচারের পাশাপাশি সতর্কতার ঢালটা ধরে রেখে জয় বাংলা বাহিনীর কাজটাও চলতে থাকে।

১৯৭০-এর ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় হয়। ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয় লাভ করে পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুই হন পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী। সামনের প্রধন কাজ হয় নতুন সংবিধান রচনা করা এবং সে সংবিধানে ৬ দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠন করা। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬ দফার বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেন। অনেক টানাপোড়নের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে ঘোষণা দেন যে, ৩ মার্চ ১৯৭১ গণপরিষদের অধিবেশন ঢাকাতে বসবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের ঘোষণা এলেও একটা আশঙ্কার মধ্য দিয়ে দিন পার হচ্ছিল। আমাদের আশঙ্কাই সত্যি হলো। ষড়যন্ত্রই সফল হলো। বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা পাকিস্তানিরা দিতে চায় না। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ দুপুর একটার দিকে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণের মাধ্যমে গণপরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করে দেন। কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়া লাগেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা দেশ একটা প্রতিবাদমুখর অবস্থায় চলে গেল। সেদিন আওয়ামী লীগ সদ্য নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং ছিল মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীতে। সবাই মিছিল করে হোটেল পূর্বাণীর দিকে যেতে লাগল। ঢাকা স্টেডিয়ামে সেদিন ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। দর্শকরাও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পূর্বাণী হোটেল থেকে বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে হরতালের ঘোষণা এলো। পল্টন লোকেলোকারণ্য। ছাত্রনেতারা ঘোষণা দিয়ে দিলেন ২ ও ৩ মার্চ ১৯৭১ হরতাল পালন করার। ২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বটতলায় সকাল ৯টার দিকে ছাত্র জনসমাবেশ আহ্বান করা হয়।

২ মার্চ ১৯৭১ সালের ছাত্র জনসমাবেশ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন– বক্তব্য দেওয়ার জন্য কলা ভবনের গাড়ি রাখার ছাদে উঠে দাঁড়ান।

এই সমাবেশেই জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ নিয়ে আসেন নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জাহিদ হোসেন ও রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা মহিবুল ইসলাম ইদু। চিকন একটা বাঁশের মাথায় পতাকাটি লাগানো ছিল। আমি সেদিন ওই সমাবেশে গাড়ি বারান্দার নিচেই ছিলাম অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে। আমি সত্যিই অবাক হই, এ জন্য যে সিদ্ধান্ত ছাড়া জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন পতাকা কেন জাহিদ নিয়ে আসলেন। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে পতাকাটি জাহিদের কাছে এলো? এ প্রসঙ্গে বলা দরকার মনে করি।

আগেই বলেছি ৭ জুন জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজের পর পতাকাটি আমার হেফাজতে বুয়েটের হলে নিয়ে এসে খাবিরুজ্জামানের কাছে রাখতে দিই।

১৯৭০ এর নভেম্বরের দিকে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের তরফ থেকে শেখ জাহিদ হোসেন জয় বাংলা বাহিনীর একটা প্যারেড করার উদ্যোগ নেন। সেজন্য তিনি আমার কাছ থেকে পতাকাটি চেয়ে নেন, ওই প্যারেডে ব্যবহার করার জন্য। কাজটা ভালো মনে করে আমি পতাকাটি জাহিদকে দিয়ে দিই। তার বাসা ছিল গুলবাগে। তিনি তার বাসায় নিয়ে রাখেন। যাই হোক পরিবর্তীতে ওই নগরের প্যারেড এর কর্মসূচি আর হয় না। আমি তাই বেশ কয়েকবার জাহিদকে তাগাদা দিয়েছি যে পতাকাটা ফেরত দিয়ে দেওয়ার জন্য। দিচ্ছি-দিব করে তা আর দেওয়া হয়নি। এ রকম অবস্থায় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এসে যায়।

জাহিদের কাছে রক্ষিত পতাকা কীভাবে প্রকাশ পায় তা জাহিদ লিখে গেছেন তার বই, ‘মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স-বিএলএফ’ এ।

কীভাবে কলা ভবনে জাহিদ পতাকাটি আ স ম আবদুর রবকে হস্তান্তর করেন এবং কী পরিস্থিতি সেখানে বিরাজ করছিল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বইটিতে। পুনরাবৃত্তি না করে বরং আমি তার বই থেকে

উদ্ধৃতি করে দিচ্ছি। আমার কাছে লেখাটা সঠিক ও বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে। তার বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন।

২ মার্চ **১৯৭১** সালের কলা ভবনের মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য সকালেই গুলবাগে জাহিদ প্রস্তুত হন। সেই সময় তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য যেসব ছেলেরা জড়ো হয় তার ঘরে, তারা ঘটনাচক্রে বইয়ের তাকে রাখা পতাকাটি আবিষ্কার করে। শেখ জাহিদের ভাষায়, '২রা মার্চ সকালে পাড়ার ছেলেরা এক এক করে আমার বাসায় আসে একসঙ্গে মিছিল করে বটতলায় যাওয়ার উদ্দেশে। ওদেরকে রুমে বসিয়ে রেখে আমি ভেতরে যাই সেদিনকার মতো বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। পাড়ার ছেলেরা রুমে বসে বইয়ের তাক থেকে ২ ফেব্রুয়ারির সংকলনগুলো দেখতে থাকলে সংকলনের নিচ থেকে পতাকাটি বেরিয়ে পড়ে। এরা কেউই জহুর বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না এবং সে কারণেই পতাকার বিষয়ে কিছুই জানত না, কিন্তু পতাকার মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র থাকায় সে সময়ে এর মানে বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হয়নি। আগ্রহ উত্তেজনা এবং উৎসাহের সঙ্গে পতাকাটি উপস্থিত সকলের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। এ সময় গুলবাগ আমার বাসার পাশে রেল লাইন দিয়ে একটি ট্রেন কমলাপুর থেকে ছেড়ে সম্ভবত ময়মনসিংহ যাচ্ছিল, ছেলেরা রেল লাইনের পাশের লাউয়ের মাচা থেকে একটি বাঁশ খুলে নিয়ে পতাকাটি বাঁধে এবং যেহেতু সেদিন ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে হরতাল ঢাকা হয়েছে, তাই ওরা পতাকাটি হাতে নিয়ে রেল লাইন অবরোধ করে দাঁড়ায়। ট্রেন থামার পর যাত্রীরাও নতুন ধরনের পতাকা দেখে ভিড় করে নেমে আসে। এর মধ্যে আমি রেডি হয়ে যখন বাসার বাইরে আসি তখন বাসার সামনে পতাকাটি ঘিরে ছাত্র-জনতার বেশ বড়সড় ভিড় জমে গেছে। আমি এসে এদের সঙ্গে যোগ দিতে পতাকাটি আমার হাতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং আমরা মিছিল করে বটতলার দিকে রওনা হই। মিছিলটি নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী হয়ে রমনা 'প্রেসিডেন্ট হাউস' (বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধা) এর মিলিটারি প্রহরীদের উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে আমরা রমনাপার্ক এবং রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মাঝখান দিয়ে কোণাকুণি হেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন বটতলার সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছানোর আগেই বটতলায় সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেদিনের ছাত্র সমাবেশে বটতলায় কোনো মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ধারণার বাইরে ছাত্র-জনতা উপস্থিত হওয়ায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস খান মাখন ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী, সহ-সম্পাদক একরামুল হক, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জিনাত আলী ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, ঢাকা শহর শাখার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক চৌধুরী মোশতাক প্রমুখ নেতারা বাধ্য হয়ে বটতলার পাশে কলাভবনের পশ্চিম দিকের প্রবেশ মুখের সিঁড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমরা পতাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকার অব্যবহিত পরেই চারদিকে বিপুল সাড়া পড়ে যায়, সামনে বসে যাঁরা বক্তৃতা শুনছিলেন তারা সকলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাত তালি দিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানায়। এ সময়ে স্লোগানে স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। সামনের দিক থেকে সবাই সরে আমাদেরকে সিঁড়ির ছাদের কাছে যাওয়ার পথ করে দেয়, সভার মাঝখান দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির ছাদের নিচে গিয়ে পতাকাটি উপরে ছাদে দাঁড়ানো আ স ম আবদুর রবের হাতে তুলে দিই। আ স ম আবদুর রব পতাকাটি হাতে নিয়ে উপরে তুলে ধরে দোলাতে থাকলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মুহুর্মুহু স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এরপর আর কারও পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া বা সভার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না, বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভায় আসার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্লোগান দিতে দিতে বটতলা থেকে অসংখ্য মিছিল যার যার গন্তব্যের দিকে বেরিয়ে যায় বিকালের সভায় আসার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য।

২ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেদিন সকালে যারা বটতলার ছাত্রসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তারা যে যেভাবে পতাকাটি দেখেছেন সেভাবেই ছোট, বড়, মাঝারি আকারের হাজার হাজার পতাকা বানিয়ে নিয়ে আসেন। একদিন যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা এই পতাকার রূপ দিয়েছিলাম একটি

আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটি এমনিভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে যায়, পরিণত হয় জনতার সম্পদে।”

শেখ জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে যে মিছিলটি জয় বাংলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ফ্ল্যাগ নিয়ে সেই মিছিলে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা ইদুও ছিলেন। পুরো মিছিলে ইদুই পতাকা বাঁধা বাঁশের লাঠি তিনিই কাঁধে করে বহন করে আনেন কলা ভবনের কাছে। পরে তা শেখ জাহিদ হোসেনকে দিয়ে দেন। এই মিছিলেই নগর ছাত্রলীগ নেতা মৌচাক থেকে আজিজুল হক চৌধুরী কাওসার, শাহাবুদ্দিন প্রমুখেরা শরীক হন।

যা মাঠে ঘটেছে তার বিবরণ এটাই বলে দিচ্ছে যে, ওই সময়টা ছিল এমনই উত্তাল যে অনেক সিদ্ধান্ত বা অনেক কর্ম মাঠ কর্মীরা করেছেন যা আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে এবং সমৃদ্ধ করেছে। উঁচু পর্যায়ের নেতারা তা গ্রহণ করে জাতীয় সিদ্ধান্তে পরিণত করেছেন।

জয় বাংলা বাহিনীর পতাকা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হয়। কিন্তু জয় বাংলা বাহিনীর পতাকা, বাংলাদেশে পতাকায় রূপান্তরের ঘটনা কোনো সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়নি। ২ মার্চ ১৯৭১ সালে কলা ভবনের ছাত্র সভায় কোনো পতাকা উড়ানোর কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ওই পতাকা প্রদর্শন হয় ঘটনাচক্রে। এমনকি যদিও ঘটনাচক্রে পতাকাটা আনেন যেহেতু অন্য ছেলেরা বইয়ের তাকে পতাকাটা দেখে বের করে আনে। আমার কাছে রক্ষিত পতাকাটি যদি জাহিদ না নিয়ে যেতেন তবে ২ মার্চ আর পতাকা প্রদর্শনই হতো না। ওই সময়ের আন্দোলনের সৌন্দর্য হচ্ছে মাঠের কোনো কাজ জনগণ যদি গ্রহণ করে নিত তাহলে শীর্ষ নেতারা সানন্দে মেনে নিতেন। সে যা হোক, এই হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকার জন্ম কথা।

পরের দিন ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শাজাহান সিরাজ যে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন, সেখানে মানচিত্রসহ লাল সবুজের ওই ২ মার্চ প্রদর্শিত পতাকাটাকে বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে।

২৫ মার্চের পর বাংলাদেশ সরকারের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে যে যাত্রা শুরু হয়, সেখানে এই পতাকাই উড়ানো হয়। এই

পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ হয় এবং বিজয় অর্জন করা হয়। পতাকা তৈরিও একটি আন্দোলনের অংশ এবং তা তৎকালীন সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। আন্দোলন-সংগ্রামের এক এক পর্যায়ের এক এক রকম সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের সিঁড়ি বেয়ে জনতার কাতার থেকে জন্ম নেয় আমাদের বাংলাদেশের পতাকা।

হাসানুল হক ইনু
(ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বুয়েট শাখা, নিউক্লিয়াস-এর সদস্য। বর্তমান সভাপতি, জাসদ)